১৯৮৬.

093.7
926.M
Vol. 57

093'7
P926M
vol: 57

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

খণ্ড ৫৭ ১৯৮৬-৮৭

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক : স্বরাজব্রত সেনশর্মা, শিরিন মাসুদ, গৌরীশঙ্কর ঘটক

প্রকাশন সচিব : জয়িতা ঘোষ

সম্পাদক : শুভা মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব সাহা

সহ-সম্পাদক : কৌশিক চৌধুরী, উদ্দালক ভট্টাচার্য।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
সমীর রায়

অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত এবং অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙা স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ—গ্রাফিটেক ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

সূচীপত্র

সুনীল রায়চৌধুরী	ক	মুখবন্ধ
জয়িতা ঘোষ	খ	প্রকাশনা সচিবের প্রতিবেদন
অপূর্ব সাহা	গ	সম্পাদকীয়র পরিবর্তে
বিনয় মজুমদার	১	কবিতা
শঙ্খ ঘোষ	৪	জলছবি
শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়	৫	স্বদেশবাসীর চোখে কবি মনমোহন
সুকান্ত চৌধুরী	৯	নবোদয় ও বোধোদয়
বিপ্লব মুখোপাধ্যায়	১৩	শিল্পে সমাজবাস্তবতা ও নান্দনিকতা
সুদীপ্ত সরস্বতী	২০	বিজ্ঞানশিক্ষা ঃ বিকল্প পথের খোঁজে
কৃত্তিবাস রায়	২৫	তুলনামূলক
অভিজিৎ দত্ত	২৫	কবিতা
যশোধরা রায়চৌধুরী	২৬	কবিতা
অদ্রীশ বিশ্বাস	২৭	দুপুর
স্বপন রায়	২৭	ঝড় তোলে বন্দী বাতাস
সৌম্য দাশগুপ্ত	২৮	কানুন
দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	মেঘের গল্প
বার্ণিক রায়	২৯	হরিণী
নীরদবরণ চক্রবর্তী	৩০	দেখা
সুকৃতি লহরী	৩৩	বহুরূপী ও রবীন্দ্রনাটক
অসিত সেন	৩৯	'কৃষ্ণচরিত্র'-এর দার্শনিক প্রত্যয়ের উদ্ভাবনভূমি
অচ্যুত মণ্ডল	৪৩	মোহনায় এক মানুষ
অমিতেন্দু পালিত	৪৫	প্রজন্ম
অপূর্ব সাহা	৪৯	দময়ন্তী হন দময়ন্তী
	৫১	কলেজ প্রাসঙ্গিকী
	৫৫	পরিচিতি

Contents

Saibal Gupta	1	Reminicsences
Swarajbrata Sensarma	5	Lucio Piccolo : Winters Without Heart
Udayan Mitra	13	Adulthood
Abheek Barman	14	Ways of Seeing
Santanu Majumder	20	The Return
Suhit Kumar Sen	21	Convergences
Indraneel Dasgupta	22	Sartre Marx and the existential dilemma
Sougata Ghosh	26	Sand Castles
Bhanu Singho Ghosh	31	People see what they are prepared to see
Abheek Barman	34	Variation on Lara's theme
Suman Dhar	35	The making of a Myth
Ananya Chatterjee	36	Dancing to Tagore
Uddalok Bhattacharya	39	Class Struggle in the College Canteen
Atanu Basu	41	Just another evening
Udayan Majumber	42	Memories
Editorial	44	Subha Mukherji

HINDI

Kamalesh Kumar Pandey	1	Yugaprabartaka Bharatendu Harishchandra
Ashok Tripathi	2	Rastrakabi Maithilisaran Gupta

মুখবন্ধ

গত বছরের প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা প্রকাশের পর প্রায় এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই এক বছরে কলেজের বিভিন্ন বিভাগে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এই রকম একটি পরিবর্তনের সুবাদে গত বছর আগস্ট মাসে এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদানের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পত্রিকার মারফত কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং অ-শিক্ষক কর্মচারী বন্ধুদের আমার আন্তরিক প্রীতি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গত কয়েকমাসে সকলের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি, তার তুলনা নেই। আশা করি, ভবিষ্যতেও তাঁদের সকলের কাছ থেকে একই রকম ব্যবহার পাব।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সমস্যা বহুবিধ ও অত্যন্ত জটিল। এত অল্প সময়ে এইসব সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, সমস্যাগুলো বুঝে ওঠাও বেশ কঠিন। তবুও আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছি সমস্যাগুলো বোঝবার এবং এগুলোর সমাধানের সূত্র বের করবার। বিভিন্ন বিভাগের জন্য স্থানাভাব ও গ্রন্থাগারের প্রসার কলেজের একটি বড় সমস্যা। এর সমাধানের জন্য কলেজ ভবনের সম্প্রসারণের একটি প্রস্তাব পূর্ত-বিভাগের কাছে পেশ করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে খরচের হিসাব পেলে শিক্ষা বিভাগের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য শৌচাগারের ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক নয়, বহুদিন আগে তৈরী জল নিকাশের ব্যবস্থাও বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই সমস্যাগুলোও পূর্ত বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগের নজরে আনা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের খেলাধূলার ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে, ব্যাডমিন্টন কোর্টটি নতুনভাবে তৈরী হচ্ছে। কমনরুমে আসবাবপত্র ও খেলাধূলার সরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির জন্য নতুন যন্ত্রপাতি কেনার উদ্যোগ চলেছে। আশা করা যায়, এগুলি রূপায়িত হলে বর্তমান অবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে।

এর পরে আসা যাক কলেজ পত্রিকা প্রকাশের সমস্যায়। অর্থাভাবের জন্য কলেজ পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ, এর উন্নত মান, কলেবর ও অঙ্গসৌষ্ঠব রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন—প্রায় অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকবৃন্দ, প্রকাশন-সচিব এবং সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যরা। এঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। আশাকরি এবারকার কলেজ পত্রিকা অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সুনীল রায়চৌধুরী
অধ্যক্ষ
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

প্রকাশন সচিবের প্রতিবেদন

অতীতে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রভূমি হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা শুধুমাত্র সাহিত্য-কাগজ হয়ে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু এই চিরাচরিত রূপটার পরিবর্তন হচ্ছে কালের প্রভাবে। আজকের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে এটাই বলব—এই কলেজ পত্রিকায় যেমন উদীয়মান কবিসাহিত্যিকদের উৎসাহ দেওয়ার আবশ্যিকতা আছে তেমনি সকলের সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশের এবং আশাআকাঙ্ক্ষা ও হতাশার কারণ ব্যক্ত করার মাধ্যমও এটাই। বহুবছর আগে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় অধ্যক্ষ H. R. James কিন্তু এই কথাই বলেছিলেন, এই পত্রিকা সকল ছাত্রছাত্রীর, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর না। এই পত্রিকা প্রকাশের সবচেয়ে অন্তরায়—আর্থিক। সরকারী বরাদ্দ মাত্র সাড়েতিন হাজার টাকা, কাজেই পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে কিছু বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হয়েছে।

এবার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলছি। কলেজ পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ সবথেকে বেশী কিন্তু গুণগত লেখার সংখ্যা কম। আর একটা কথা না বলে পারছিনা প্রত্যেক বছরের প্রকাশন সচিবের উচিত পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত কাজকর্ম—তথা দেনাপাওনা মিটিয়ে দেওয়া। এই কাজ যদি অসম্পূর্ণ থাকে (যেমন গতবছরে ছিল) তাহলে মুশকিল হয় পরবর্তী প্রকাশন সচিবের। কাজেই প্রতিবছর প্রকাশন সচিব যদি তার কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে কাজকর্ম ও হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে যায় তাহলে পরবর্তী প্রকাশন সচিব বোধহয় একটু সময় পান ভাবনা চিন্তা ও আলোচনার মাধ্যমে এই পত্রিকার ভাবমূর্তি ও ঐতিহ্যরক্ষার উপায় ঠিক করতে।

যাই হোক এভাবেই পত্রিকা বেরোচ্ছে সমস্ত প্রতিকূলতার পাশ কাটিয়ে, ডিঙিয়ে। মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীসুনীল রায়চৌধুরীকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত ব্যাপারে আমাদের পাশে থেকে সুস্পষ্ট মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য। এই পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা শ্রীমতি শিরিন মাসুদ ও অধ্যাপক শ্রীস্বরাজব্রত সেনশর্মা ও শ্রীগৌরিশঙ্কর ঘটককে ধন্যবাদ মতামত ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ধন্যবাদ জানানোর মত সম্পর্ক নয় এ পত্রিকাও তাদেরই। তবুও এব্যাপারে সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও বন্ধু প্রসূন ও শুভ্রজিতের নাম না করে পারছি না।

জয়িতা ঘোষ

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে ঃ

সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে

প্রীতিভাজনেষু, এমতাবস্থায় একটা প্রবল ভয় আমাদের ঘিরে ধরে, যাবতীয় নষ্টবোধ কুরে কুরে খায় ইন্দ্রিয় সচেতনতা, আমরা পেণ্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছি দ্বান্দ্বিক আঘাতে-প্রতিঘাতে। পথের কোন শুরু ছিলনা, শেষ কোথায় তাও আমাদের জানা নেই। শুধু এগিয়ে যাওয়া। নাকি মানুষই স্থির ? রাস্তা তাকে ফেলে দৌড়ুচ্ছে ? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নামক শব্দের ভেতর দিয়ে অভিজ্ঞানপত্রের ছাপ ভবিষ্যত নির্দিষ্ট করে দেয় আপনার। এ এক মজার শহর ! হাট্টিমাটিমের দেশ হয়তো এটাই !

শহর কলকাতায় জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীর লাঠি চলে, 'আরওয়াল' বুদ্ধিমান মানুষের মনে 'বেদনা'র জন্ম দেয় ! গতপ্রাণ মোলায়েজের উদ্দেশ্যে হাজারো কবিতা রচনায় বঙ্গভাষী লেখকেরা তা ছাপাতেই হয়তো বা অধিক আগ্রহী। সহৃদয় (!) প্রধানমন্ত্রী গাড়ী চালিয়ে ঢুকে যান গ্রামে, ন্যাংটো ছেলের হাত ধ'রে ছবি ওঠেন—পাঠক, ইহাকেই অশ্লীলতা কয়। কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষের খবর বুর্জোয়া সংবাদপত্র অধিক ছাপায় না, তুলনামূলকভাবে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা 'ব্যথা'-দানে সক্ষম। আজিজুলের 'উজ্জ্বল উদ্ধারে' বন্দীমুক্তির স্মৃতি রোমন্থন করে কেউ। মাঝে মাঝে মনে হয় গাজনের মেলায় ভীড়, হুড়োহুড়ি—এরই মধ্যে একা একা প্রত্যেকেই পুতুলনাচের খেলা দেখছি, যা কিনা সংবাদপত্র পাঠেরই নামান্তর। ভূয়া রাজনীতির নাগরদোলায় বৃত্তাকারে ঘুরে প্রধানমন্ত্রী তৃপ্ত হন, 'দেশ একবিংশ শতাব্দীর পথে চলিয়াছে' এবং তাঁর মহান কর্তব্য ভারতবাসীর কড়ে আঙুল ধ'রে সভ্যতায় আলোয় তাদের পরিপূর্ণ করে তোলা। যদিও একথা সকলেরই জানা যে, ২০০০—১৯৮৭ = ১৩ অর্থাৎ আর মাত্র তের বছর পরেই একবিংশ শতাব্দীর সূচনা। সুতরাং এ ব্যাপারটিকে গাণিতিক প্রমাণমাত্র বলা যেতে পারে।

এ হেন জটিল এবং নিষ্ঠুর সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা বেরোল। মেধায় মোটামুটি একই গোত্রের হলেও এ কলেজে আর্থনীতিক শ্রেণীকাঠামোয় বিভাজিত ত্রি-বিত্তের আশ্চর্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সে আপনি পাতা উল্টোলেই টের পাবেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের ভাবনায় সমৃদ্ধ এ পত্রিকা—বিষয় নির্বাচনে আমরা কোনরকম জোর খাটাবার চেষ্টা করিনি। যেহেতু ধারণাটা ছিল সামগ্রিক রূপের।

সরাসরি পত্রিকা প্রসঙ্গে বলা যায় কোনো ভাল লেখা পেয়েও শেষমুহূর্তে আমরা তা ছাপাতে পারিনি। এ জন্য দুঃখপ্রকাশ ছাড়া আপাতত আর কোন উপায় নেই। কৌশিক, জয়িতা, শুভ্রজিৎ, সঞ্চিতা, মৈত্রিশ, অমিতেন্দু, শুভা, বুজো, অচ্যুত, তথাগত, প্রসূন ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদার্হ। অধ্যক্ষ এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা শ্রদ্ধাভাজন।

অপূর্ব সাহা

পুনশ্চ ঃ ১৯৮৭-তে দুই বাঙালী ভাবুক মনীষীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এঁরা হলেন বিপ্লবী দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। দর্শনে-বিজ্ঞানে, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে, সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এই দুই মনীষীরই অবদান অভিনব ও মৌলিক। এই দু'জনকে নিয়েই আমাদের দুটি সুদীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অনিবার্য বাধা বিপত্তির মধ্যে আমরা এ বছরে তা প্রকাশ করতে পারলাম না। আগামী বছরের বন্ধুদের কাছে অনুরোধ—তারা এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে।

বিনয় মজুমদার

[শব্দ কারো কারো কবিতায় হয়ে ওঠে মন্ত্রের মতো। আত্মগত তাই শব্দোচ্চারণে বিনয় মজুমদার 'কবিদের কবি'। প্রেসিডেন্সীতে আই. এস. সি. পড়তেন ১৯৫১ সালে। শোনা যায় এক নৈশ অভিযানের জন্য ইডেন হিন্দু হোস্টেল থেকে কিছুকালের জন্য বিতাড়িত হয়েছিলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রথম শ্রেণীর স্নাতক।

কীট-পতঙ্গ-লতাপাতা বিষয়ক কবিতা রচনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিনয় 'রমণীয়' কবিতা লিখেছেন। এই রমণী গায়ত্রী চক্রবর্তী। ক্ষুধার রাজ্যে বিনয়ের প্রবেশ—হাংরি আন্দোলনের শুরু। প্রাতিষ্ঠানিক ক্রীতদাসত্বে অঙ্গীকারবদ্ধ হননি কোনদিনও। কাটিয়েছেন লুম্বিনী ও সরকারপুর মানসিক হাসপাতালে জীবনের খানিকটা সময়। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ফিরে এসো চাকা', 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা',' গায়ত্রীকে' প্রভৃতি অন্যতম। ভালেরির মতোই গণিতচর্চা তাঁর প্রিয়। বিশ্বস্তসূত্রে বিনয় অবগত আছেন যে ইংলণ্ডের কোনো কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁর গাণিতিক সূত্রগুলো পড়ানো হয়ে থাকে(!)। বর্তমানে মেডিকেল কলেজের মানসিক বিভাগে চিকিৎসাধীন। কোলকাতার সূর্যালোক তাঁর প্রিয়। যেহেতু তা পৃথিবীর একমাত্র। শুদ্ধতম। কলেজ পত্রিকার জন্য তিনি তাঁর প্রিয় এক স্বপ্নের কাব্যরূপ লিখে দিয়েছেন। এছাড়া কবিকে সামগ্রিকরূপে দেখবার খাতিরে 'ফিরে এসো চাকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে দুটো কবিতা পুনর্মুদ্রিত হ'ল। —সম্পাদকমণ্ডলী]

১

ইপ্সিত শিক্ষায়তনে যাবার বাসনা হয়েছিলো।
গিয়ে দেখি ত্রস্ত মুখ, উপলক্ষ সমুদ্র উধাও।
ভ্রমর পোষে না কেউ ; নবতর হাসির মাধ্যম
সেখানে সুলভ নয় ; কাঁটাগাছ পূর্বেই প্রস্তুত।

কিছু আলোকিত হলো সমাচ্ছন্ন বাঁশ, ভবিষ্যৎ।
এখন সমস্যা এই, কোনো করবীর সঙ্গে আর
খেলার সময় কিংবা বিশ্বস্ত সুযোগ কোনোদিন
ভুলেও দেবে না কেউ ; বাকি আছে শুধু ক্ষুণ্ন ক্রয়।

(১৯৬২)

২

কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই, পরিচয় নেই ;
তবুও গোপন ঘর নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে—
এই ভেবে যদি খুঁজি, তবে বলো, এ কল্পনা কালো।
আঁধারে সকলই সখা কালো বলে প্রতিভাত হয়।

তর্কের সময় নয় ; বিপুল বিপদাপন্ন ক্ষুধা।
প্রাণে জ্যোৎস্না লেপনের সাধ যদি না-ই হয়, তবে
ছিদ্র দিয়ে ডেকে নিয়ে কেন সে যে খোলে না দরজা।
আহার করার আগে স্নান করা তারই রীতি প্রেম।

(১৯৬২)

স্বর্গের দেবসভায়

স্বর্গের দেবসভায় অর্ধবৃত্তাকারে বসে
ছিলেন দেবতাগণ আর
তাদের পায়ের নীচে মাটি, আর এইসব
দেবতার সামনেই
ইট পাঁজা করে
সে ইটের পাঁজাটির উপরে কার্পাস তুলো
প্রচুর রেখেই পাঁজাটার
ইটগুলি পুরোপুরি ঢেকে দিয়ে রেখেছিল
মৃত্তিকার মেঝের উপরে
এবং এ তুলোঢাকা ইটের পাঁজার আর
দেবতাদিগের মাঝখানে
ইন্দ্রাণী নেচেছিল রে আমার চোখের বৃত্তটি দিয়ে
দেখেছি আমি
বিনয় মক্কেল
এবং দেবতাগণ, ইন্দ্রাণী, তুলোর পাঁজা
যোগ করা সরল রেখার
বর্দ্ধিত অংশের পরে সিনেমার ক্যামেরাটি
মানে
স্বর্গে মেঘলোকে খুব নেচেছিল
ইন্দ্রাণীরে সিনেমার
পর্দাতেই দেখেছিস কলকাতা
শুদ্ধ লোকে / চুলে মাখি
নারিকেল তেল।

(১৯৮৭)

১

ইপ্সিত শিক্ষায়তনে যাবার বাসনা হয়েছিলো।
গিয়ে দেখি ত্রস্ত মুখ, উপলক্ষ সমুদ্র উধাও।
ভ্রমর পোষে না কেউ ; নবতর হাসির মাধ্যম
সেখানে সুলভ নয় ; কাঁটাগাছ পূর্বেই প্রস্তুত।

কিছু আলোকিত হলো সমাচ্ছন্ন বাঁশ, ভবিষ্যৎ।
এখন সমস্যা এই, কোনো করবীর সঙ্গে আর
খেলার সময় কিংবা বিশ্বস্ত সুযোগ কোনোদিন
ভুলেও দেবে না কেউ ; বাকি আছে শুধু ক্ষুণ্ণ ক্রয়।

(১৯৬২)

২

কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই, পরিচয় নেই ;
তবুও গোপন ঘর নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে—
এই ভেবে যদি খুঁজি, তবে বলো, এ কল্পনা কালো।
আঁধারে সকলই সখা কালো বলে প্রতিভাত হয়।

তর্কের সময় নয় ; বিপুল বিপদাপন্ন ক্ষুধা।
প্রাণে জ্যোৎস্না লেপনের সাধ যদি না-ই হয়, তবে
ছিদ্র দিয়ে ডেকে নিয়ে কেন সে যে খোলে না দরজা।
আহার করার আগে স্নান করা তারই রীতি প্রেম।

(১৯৬২)

স্বর্গের দেবসভায়

স্বর্গের দেবসভায় অর্ধবৃত্তাকারে বসে
ছিলেন দেবতাগণ আর
তাদের পায়ের নীচে মাটি, আর এইসব
দেবতার সামনেই
ইট পাঁজা করে
সে ইটের পাঁজাটির উপরে কার্পাস তুলো
প্রচুর রেখেই পাঁজাটার
ইটগুলি পুরোপুরি ঢেকে দিয়ে রেখেছিল
মৃত্তিকার মেঝের উপরে
এবং এ তুলোঢাকা ইটের পাঁজার আর
দেবতাদিগের মাঝখানে
ইন্দ্রাণী নেচেছিল রে আমার চোখের বৃত্তটি দিয়ে
দেখেছি আমি
বিনয় মক্কেল
এবং দেবতাগণ, ইন্দ্রাণী, তুলোর পাঁজা
যোগ করা সরল রেখার
বর্দ্ধিত অংশের পরে সিনেমার ক্যামেরাটি
মানে
স্বর্গে মেঘলোকে খুব নেচেছিল
ইন্দ্রাণীরে সিনেমার
পর্দাতেই দেখেছিস কলকাতা
শুদ্ধ লোকে / চুলে মাখি
নারিকেল তেল।

(১৯৮৭)

জলছবি

শঙ্খ ঘোষ

ব্রত

যে গ্রহনক্ষত্র ছিল ওই চোখে তার কিছু স্বাদ
এই অমাবস্যা থেকে ঝরুক তোমারও চোখেমুখে
প্রায় শিশিরের মতো, অগ্নিকণা বিঁধে নিয়ে রোমে
ব্রতপালনের দিকে ঝুঁকে থাকো নিশিজাগরণ।

গ্রাস

বৃষ্টি হতে থাকে, গঙ্গা কালো হয়ে আছে প্রতিপদে
নিকষ রাত্রির ঘাট শুয়ে আছে শুচিপ্রতীক্ষায়
সারি সারি শব রেখে চুল্লি বসে আছে গ্রাস নিয়ে
যে-কোনো মৃত্যুই আজ দাবি করে পোস্ট-মর্টেম।

শিল্প

শব্দ নিশানের উড়ালপথ ধরে, মশাল তুলে দেয় শিল্পী
এমনই গঙ্গার ভঙ্গ মুছে নেয় দ্বিধার দ্বন্দ্বের লজ্জা—
তুমি যে আমাদের সঙ্গে যেতে চাও সেটাই আমাদের শক্তি
আমরা বুঝে নেব জীবনজটিলতা তোমার চোখে চাই স্বপ্ন।

স্বদেশবাসীর চোখে কবি মনমোহন

শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়

বাংলার সারস্বত সমাজে মনমোহন ঘোষ একটি স্মরণীয় নাম। স্মরণীয় কবি—অধ্যাপক রূপে। তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি কবি, ইন্দো-ইংরেজি কবিতায় যিনি যশস্বী। কিন্তু সমকালে তাঁর সমধিক পরিচিতি বোধ হয় অধ্যাপক হিসেবে। ইংরেজি সাহিত্যের ডাকসাইটে অধ্যাপক, যিনি দুদশকেরও অধিককাল (১৮৯৬—৯৭, ১৯০৩—২৪) প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা-কর্মে ব্রতী ছিলেন। কবি-খ্যাতি তিনি লাভ করেছিলেন অক্‌সফোর্ডে ছাত্রাবস্থাতেই এবং ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা করে তখনই তিনি সমকালীন কবিদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিলেন! অস্কার ওয়াইল্ডের কথায় অকসফোর্ডে সেরা ছাত্রদের অন্যতম মনমোহন (Manmohan) সেদিন সহজেই ইংরেজ কবিদের মন হরণ করতে পেরেছিলেন। তারপর স্বদেশে ফিরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে স্বক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠা পেলেন। স্বগৃহে নিভৃতে কাব্যরচনা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে শ্রেণীকক্ষে কবিতা পাঠ, কবিতা বিশ্লেষণ, উপভোগ ও মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন কবিতার সৃষ্টি। ছাত্রদের মনের জগতেও অভূতপূর্ব এক অনুভূতির শিহরণ। শ্রেণীকক্ষে শেলী, কীট্‌স্ ও অন্যান্য রোমান্টিক কবিদের শুধু জীবন্ত উপস্থিতি নয়, কবিতার ভিতর থেকেই নতুন কবিতার আবির্ভাব—এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

কিন্তু মনমোহনের মৃত্যুর প্রায় অর্ধশত বর্ষ পরে অর্থাৎ সত্তর দশকে তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু উক্তি আমাদের মনে অন্য এক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করেছে। যেমন, একটি উক্তি অধ্যাপক-কবি পি. লালের। অন্যটি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের। প্রথমটিতে কবি মনমোহনের উপর কটাক্ষপাত, যে কবিকে 'মহান' হরিনাথ দে 'এ্যাপোলো' বলতেন। দ্বিতীয়টিতে মনমোহনের স্বদেশপ্রীতির উপর, অপরাধ হয়তো শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ বলে। প্রথমটির প্রসঙ্গে প্রথমে আসি। এক রবিবাসরীয় স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় (৮ই মার্চ, ১৯৭০) ইন্দো-ইংরেজি রচনায় নব আন্দোলনের আলোচনার সুরুতেই অধ্যাপক-সমালোচক লাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিদ্যাবুদ্ধি' সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই মনমোহন ঘোষের কাব্যগ্রন্থ **Songs of Love and Death** স্নাতক সাম্মানিক স্তরে ইংরেজি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং মন্তব্য করলেন: "...it seemed odd to us that we should be reading a poet who hymned the glory of the departed Sahibs". ভাবতে দুঃখ হয়, যে কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে কবি ইয়েট্‌স্ বলেছিলেন 'one of the most lovely works in the world', যেটি কবির সমগ্র জীবনের একটি গীতিমাল্য, যেখানে জীবনের গভীর বেদনা সংহত হয়েছে এবং বেদনা থেকে উত্তরণেরও আভাস আছে, যেটি পড়তে পড়তে কবি ইয়েট্‌সের দুচোখে জলে ভরে উঠেছিল, সেই গ্রন্থটি অধ্যাপক-কবি লালের কাছে একেবারে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হলো এবং তার মধ্যে তিনি শুধু বিদায়ী সাহেবদের স্তাবকতাই দেখতে পেলেন। অন্য কিছু নয়। তাঁর যুক্তিহীন উক্তির অসারতা সম্পর্কে অন্য একটি নিবন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় অভিযোগটিই এখানে আলোচ্য।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের। **শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন** শীর্ষক নিবন্ধে তিনি শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশপ্রেমের আলোচনা প্রসঙ্গে অগ্রজ মনমোহন সম্পর্কে মন্তব্য করলেন: "তাঁর দাদা

মনোমোহনের প্রাণে এরূপ কোন স্বদেশ-প্রীতি জাগে নাই—এবং তিনি দু একটি চিঠিতে স্পষ্ট এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন—যে দেশের স্বাধীনতা লাভ তো দূরের কথা, তাদের বর্তমানে অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁর কোন ভাবনা বা উদ্বেগ নাই।" [শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১১৩]

জানি না কোন চিঠির ভিত্তিতে মনমোহন সম্পর্কে এরূপ বিরূপ মনোভাব তাঁর গড়ে উঠেছিল। একথা সত্য, আঠারো বছর বয়সে ইংরেজ শাসনে ভারতের দুরবস্থার কথা ভেবে মনমোহন একটি রাজনীতি-গন্ধী কবিতা লিখেছিলেন এবং সেটি ছিঁড়ে ফেলবেন এ কথা জানিয়ে বন্ধু লরেন্স বিনিয়নকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন। কেননা তিনি বলেছিলেন : I shall bury myself in poetry simply and solely এবং তখন থেকেই কবিতাকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য তাঁর ভিষ্টা ছিল অটুট। কবিতা ছিল তাঁর কাছে জীবন। সেখানে রাজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজিক সমস্যার কোন অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এ কথাও সত্য যে ইংল্যাণ্ড তাঁর কাব্যের পটভূমি, তাঁর ধাত্রীমাতা, তাঁর দ্বিতীয় বাসগৃহ যেখানে অনুজ অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের নানা রঙের দিনগুলি তিনি কাটিয়েছেন এবং যেখানে আবার ফিরে যেতে চেয়েছিলেন প্রৌঢ় বয়সে গভীর দুঃখে, হয়তো দেশমাতার উপর অভিমান করেই। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। দীর্ঘ দশবছর ধরে কবি-জায়া মালতী রোগশয্যায়, বাকশক্তিহীনা একান্ত নিঃসঙ্গ বন্ধুহীন তাঁর জীবন। আক্ষেপ করে কবি-বন্ধু বিনিয়নকে তিনি লিখেছিলেন ১৯১৬ সনের ৭ই জানুয়ারী : "...For years not a friendly step has crossed my threshold ; and for myself, my life has been spent between my lecture room in College and my own door step. With English people in India there can be only a nodding acquaintance or official connection, and with Indians my purely English bringing up and breeding puts me out of harmony ; denationalised that is their word for me." কবির মনে যখন এমন পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বেদনা তখনও কিন্তু কাব্যসাধনায় ছেদ পড়েনি। বন্ধুকে গদ্য-রচিত একটি কবিতাও পাঠিয়েছিলেন চিঠিটির সঙ্গে। স্বভাবতই দীর্ঘ রোগভোগের পর মানবী ঈভ মালতী যখন কবিকে ছেড়ে পরপারে চলে গেলেন, আবার একান্তভাবে কাব্যসাধনায় মগ্ন হওয়ার বাসনায় ভগ্ন-স্বাস্থ্য কবি সকন্যা ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেললেন ১৯২৪ সনের মার্চ মাসে। কিন্তু অদৃষ্টের এমানই পরিহাস ১৯২৪ সনের সুরুতেই (৪ঠা জানুয়ারী) কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কলকাতাতেই। স্বদেশ ছেড়ে যাওয়া আর হলো না।

স্বদেশবাসী কবির জীবদ্দশায় তাঁর সম্পর্কে যাই ভেবে থাকুন, তাঁরা যে তাঁর প্রতি সুবিচার করেন নি বা করতে পারেন নি সেই বেদনা কবির মনে তীব্র হয়ে বেজেছিল। রবীন্দ্রনাথও সেকথা বুঝেছিলেন। হয়তো সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ মনমোহনের স্মৃতিসভায় সভাপতির অভিভাষণে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন···'অসামান্য অধিকার নিয়ে যে ভাষায় তিনি তাঁর বাঁশী বাজিয়েছিলেন সে ভাষার দেশ এ দেশ নয়।' তবু রবীন্দ্রনাথ সেদিন এই আশাই প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর সমগ্র কাব্য প্রকাশিত হলে সকলেই আনন্দের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে এবং সকল দেশের লোক তাঁর কাব্য থেকে আনন্দ পাবে। কবি মনমোহনের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিনের ব্যবধানে ইতিমধ্যে বেশ কয়েক খণ্ড কাব্যগ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশিত সুদিন আসতে এখনও অনেক দেরি। মনমোহনের জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও উল্টোসুরের কথাবার্তায় এই রকম ধারণা আমাদের হতে পারে। তবে তাঁর রচনাই তাঁর জীবন ও সাধনার উজ্জ্বল বাসর হয়ে থাকবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। যেমন মনমোহনের স্বদেশ-প্রীতি সম্পর্কে ডঃ মজুমদারের কটূক্তির বলিষ্ঠ খণ্ডন তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যেই আছে।

এখানে বিশেষভাবে একটি চিঠির কথাই বলছি। ১৮৮৭ সনে সাসেক্স্ থেকে লরেন্স বিনিয়নকে

লেখা চিঠি, যেটিকে মনমোহনের দেশপ্রেমের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কতই বা বয়স তখন। মাত্র আঠারো। ভারতবর্ষে শাসক ইংরেজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা লিখতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটি তাঁর মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে দেশের উপর লবন করের (Salt Tax) গুরুভার। দরিদ্র দেশবাসীর যেখানে নুন ভাত জোটে না, সেখানে নুনের উপরেই কর। যার অভাবে হাজার হাজার ভারতবাসীর নানা রোগে অকালমৃত্যু ঘটেছিল। তিনি লিখছেন : I must first tell you that there is a 'Salt Tax' on the people and remember that salt is a scarcity in India.....You know I suppose that without salt in some way or other people cannot live. No more do the Indians। যে বেদনায় আঠারো বছরের তরুণ-মন সেদিন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তারই দেশজোড়া বিক্ষুব্ধ বাস্তবরূপ আমরা জাতীয় স্তরে দেখলাম আরও তেতাল্লিশ বছর পরে তাঁরই সমবয়সী গান্ধীজীর ডানডি অভিযানের মধ্যে। মনমোহন সেই চিঠিতেই ভারতে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন ইংরেজ বন্ধুর কাছে। তাঁকে বলছেন তুমি যদি নিজে একবার ভারতবর্ষে গিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে তাহলে তোমার নজর পড়তো ভারতে ইংরেজ শাসন ও শোষণের ভয়াবহ কুৎসিত রূপ : You would see that the system of government is rotten to the core. It is most unjust—everything is in favour of the rulers and to the destruction, I might say, of the ruled (by the ruled I mean the uneducated Indians—the educated Indians are well enough off, as I said before). In the law courts bribery is the order of the day—I mean the bribery of policemen and underlings, yet you hear nothing of all this in England—because it would be to the prejudice of the Anglo-Indians for you to know it.

ইংরেজ শাসনে ভারতে যে শোচনীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল সে বিষয়ে তিনি লিখছেন : Since the English have got possession of India, famines have increased tell they occur now about yearly, some being great and some small ..... But you happy people in England know nothing of famines। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বন্ধুকে বলছেন, ইংরেজ আমাদের সুযোগসুবিধা দিয়েছে, আমাদের সুসভ্য করেছে এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য : India had a civilization when the English were barbarians, and it was there just the same when England negotiated India into her hands (I won't say conquered, for India never was conquered by the English, excepting certain portions). We do not want our civilization done away with, and European civilization brought in—we want the old frame-work of Indian civilization reconstructed and new life put into it. The people were much happier before the English come there—I repeat again it is only *myself and the educated class of Indians* who at all have to thank the English for anything. And rather than have millions of people in the state they are now, I would rather the small minority of educated Indians were uneducated in the English sense of the term, and Indian rule brought back.

এর পরেও কি আমরা বলবো দেশের জন্য তাঁর কোন ভাবনা, কোন উদ্বেগ ছিল না, দেশের স্বাধীনতার কথা তিনি ভাবেন নি ?

মনমোহন তারপরেও বলছেন : হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত ভারতবর্ষে যেখানে কোটি কোটি অশান্ত

ক্ষুধার্ত মানুষের তুলনায় ইংরেজি অর্থে শিক্ষিত মানুষ বড় জোর কয়েক হাজার মাত্র সেখানে তারা ইংরেজের পক্ষ নিয়ে গণ-আন্দোলন দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করলে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দেশের চরমতম দুরবস্থায় কোনরকমে বেঁচে থাকার জন্যই লড়াই যেখানে অনিবার্য (whsn the question is 'starve' or 'fight'), সেখানে প্রতিকারের জন্য আন্দোলনের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। আমাদের জাতীয় কংগ্রেস তখন আবেদন-নিবেদনের পথেই চলছিল। ইংল্যাণ্ডে দাদাভাই নৌরজি ও লালমোহন ঘোষের নরম গরম বক্তৃতা তিনি শুনেছিলেন। তিনি তাই বলেছিলেন : By all means let us agitate for reform এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন শাসন-সংস্কার ত্বরান্বিত না হলে আসন্ন অমঙ্গলের হাত থেকে রেহাই নেই। দেশজোড়া দারিদ্র্য বঞ্চনা শোষণের মধ্যে ভয়ঙ্করের পূর্বাভাস তিনি দেখেছিলেন। মনে মনে অবশ্য এই আশাই লালন করে চলেছিলেন যে অমঙ্গল যাই ঘটুক সেটা বিপ্লবের সর্বনাশা রূপ নেবে না। কেননা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুর ধৈর্য ও ইংরেজ জাতির (ইঙ্গ-ভারতীয় নয়) শুভবুদ্ধি ও ঔদার্যের উপর তাঁর আস্থা ছিল। চিঠিটির শেষদিকে বন্ধুকে বলছেন : ইংরেজ শাসকদের অবিচার ও অপশাসন সম্পর্কে আরও অজস্র তথ্য তাঁর কাছে আছে, কিন্তু সে সব বিস্তারিতভাবে বললে বন্ধু হয়তো তাঁকে 'alarmist' ভেবে বসবে। বন্ধু যাই ভাবুন, যে কারণে এই চিঠি তিনি না লিখে থাকতে পারলেন না সেটি হচ্ছে স্বদেশের দুর্দশা : The bitterness of my countrymen, woes has turned my head and soured my nature, and made spirit which is naturally gentle violent and discontented.

মাতৃভূমির প্রতি তাঁর মমত্ব ও শ্রদ্ধা এবং স্বদেশবাসীর জন্য তাঁর ভালবাসা ও ভালবাসাসঞ্জাত বেদনা কত গভীর ছিল চিঠিটির মধ্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। দেখতে পাই তাঁর বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-বোধ এবং সুগভীর দূরদৃষ্টি। সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর সুমহান ভাবনা। ইংরেজি ভাবধারায় পুষ্ট হয়েও ইংরেজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল মোহমুক্ত। ভাবতে কষ্ট হয় এমন একটি পরিশীলিত সংবেদনশীল কবি-মনে কত ব্যথাই না লেগেছিল যখন তাঁকে 'বিজাতীয়' বলে সবাই এড়িয়ে চলেছিল। আরও দুঃখ হয় যখন ভাবি তাঁর মৃত্যুর এতদিন পরেও অধ্যাপক-কবি লাল তাঁর কাব্যে কেবল সাহেবদের গৌরবগাথা ও স্তবগান শুনতে পেলেন এবং শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশ মজুমদার তাঁর মধ্যে কোন স্বদেশপ্রীতি দেখতে পেলেন না। যাই হোক কালের দরবারে মনমোহনের সঠিক মূল্যায়ণ হবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তবু আক্ষেপ থেকে যায় কোন কোন মহলে মনমোহন সম্পর্কে এখনও এমন পক্ষপাতপুষ্ট অযৌক্তিক কথা ওঠে।

নবোদয় ও বোধোদয়

সুকান্ত চৌধুরী

মডেল স্কুল বা নবোদয় বিদ্যালয় প্রকল্পটি এখন পাকা ; রূপায়ণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যতদিন এটি আলোচনাসাপেক্ষ প্রস্তাবমাত্র ছিল, তার পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি দেখানো হয়েছে। প্রকল্পটি চালু হবার পর এই তর্কবিতর্ক এক অর্থে অবান্তর। আর একদিক দিয়ে ভাবলে, এখন রূপায়ণের পর্যায়েই কিন্তু তা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। স্কুলগুলির সমর্থনে যে যুক্তি বা আদর্শের অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলি যেন অটুট থাকে ; যে প্রতিবাদ বা সতর্কবাণী শোনা গিয়েছে, সেগুলিও যাতে মনে রাখা হয়—সেটা দেখার এই তো সময়। তাছাড়া নিছক বাকযুদ্ধ বা তার্কিক বাদানুবাদে, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ দলাদলি বা গোষ্ঠীগত বিরোধ তুঙ্গে পৌঁছয়। একটা বাস্তব প্রকল্প, যা গ্রহণ না করে উপায় নেই, হয়ত' আর একটু সংযত বিবেচনার অবকাশ দিতে পারে।

তাই এই স্কুলগুলি সম্বন্ধে কিছু দ্বিধা ও চিন্তা এখানে প্রকাশ করলাম। "নবোদয় বিদ্যালয়"-এর বদলে "মডেল স্কুল" আখ্যাটিই ব্যবহার করছি, অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও সর্বজনব্যবহৃত বলে।

প্রথম প্রশ্ন, মডেল স্কুলের ছাত্রনির্বাচন নিয়ে। নির্বাচন নাকি হবে মেধাভিত্তিক। এই নীতির প্রচুর সমালোচনা হয়েছে, প্রধানতঃ সস্তা বাজারী "অ্যান্টি-এলিটিজ্‌ম"-এর রব তুলে। এমন অথসাম্যবাদ অবশ্যই বর্জনীয় ; কিন্তু যথার্থ সাম্যবাদের বিচারেও মডেল স্কুলের নির্বাচননীতি সমর্থন করা দুষ্কর। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাভিত্তিক নির্বাচন একান্ত আবশ্যক, যদিও আজ সেখানেই একাকার নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে। কিন্তু দশ বছরের ছেলেমেয়েদের মেধার একটা চলনসই বিচারও কি সম্ভব ? এই বয়সে তাদের বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশ, পূর্ণ বয়সের মেধার কতদূর সূচক হতে পারে ? বরং এখন তাদের সকলকে যথাসম্ভব সমান সুযোগ দিয়ে, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে—অর্থাৎ বয়স্ক জীবনের বিদ্যা, কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাদের প্রথম পরিচয়ের সময়ে—তাদের মেধার বিচার আরও সহজ হয় না কি ? উচ্চশিক্ষার যোগ্যতার সেটাই হবে অপেক্ষাকৃত সঠিক বিচার।

অথচ মডেল স্কুলে ভর্তির জন্য পঞ্চম শ্রেণীতেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। তার ভিত্তিতেই অল্প কিছু কিশোর-কিশোরীর জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। পরীক্ষাটি কি-রকম হবে? NCERT-র গবেষণার ফসল, যতদূর জানি, এখনও মাঠে। সাধারণ বুদ্ধিতে এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প অনুমান করা যায়।

একটি হচ্ছে I-Q test ধরনের বিশুদ্ধ বুদ্ধির পরীক্ষা। এর বিশুদ্ধতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। তর্কের খাতিরে সেগুলি বাদ দিলেও, একই বুদ্ধি কিন্তু অতি ভিন্ন বিদ্যা ও প্রস্তুতিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়ানো হবে কি করে? অপর বিকল্পটিই সম্ভাব্য: আসলে এটি হবে পুঁথিগত বিদ্যার পরীক্ষা, অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পঠনপাঠনের পরীক্ষা। এবং বলা বাহুল্য, যেসব বিত্তবানের পুত্রকন্যা "ভালো" প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শৈশব-সংহারক তালিম পেয়ে আসবে, তারাই এ পরীক্ষায় উৎরোবে। যেমন ধরুন, আমাদের বর্তমান সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসাধারণের সন্তানের ঢোকার অধিকার। কিন্তু নামী সরকারী স্কুলে দেখা যায়, প্রায় সব ছাত্রই মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের, কারণ তারাই প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ভর্তির পরীক্ষার তালিম পাচ্ছে।

এটুকু বুঝে হঠকারীরা বলবেন, ভর্তির পরীক্ষা তুলে দাও। নির্বাচনের অন্য উপায় বার করা কিন্তু অসম্ভব। আমরা কি তবে লটারি করে ছাত্র ভর্তি করব? এই সমস্যার একমাত্র সুস্থ সমাধান, একই স্তরে ভালো বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো: ষষ্ঠ শ্রেণী নয়, প্রথম শ্রেণী থেকে, বা সম্ভব হলে তারও আগে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বা শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে, সব ছেলেমেয়েকে যথাসম্ভব সমান শিক্ষা, বিকাশ ও পুষ্টির সুযোগ দেওয়া।

মডেল স্কুল কিন্তু থাকবে জেলায় একটি, তাতে ছাত্র ভর্তি হবে স্কুলজীবনের অর্ধেক অতিবাহিত হবার পর। অতএব ছাত্রনির্বাচনে সামাজিক ও আর্থিক অ-সাম্য প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

একটি কৌতুককর কিন্তু মর্মান্তিক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই সিদ্ধান্তে, যে মডেল স্কুলের এক-তৃতীয়াংশ স্থান মেয়েদের জন্য সংরক্ষণ করার "চেষ্টা হবে" ("An effort will be made")। আমাদের জনসংখ্যার নারীজাতির অনুপাত, বিস্ময়করভাবে পুরুষদের চেয়ে কম হলেও, এর চেয়ে যথেষ্ট বেশী বলেই জানি। কিন্তু নানা কারণে মেয়েরা বেশী করে নীচু ক্লাসে পড়া ছেড়ে দেয়: পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাই ছেলেরা প্রাধান্য পায়, উঁচু ক্লাসে বা কলেজে তো আরও বেশী। মডেল স্কুল এখানে নতুন সামাজিক ব্যবস্থার পথিকৃত নয়, বর্তমান ব্যবস্থার অনুসরণকারী।

একইভাবে, ভয় হয় যে গরিব ছেলেদের অগ্রাধিকার দেবার বা তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার প্রতিশ্রুতি পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা অবশ্য বলাও হয়নি: বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য ৭৫% সংরক্ষণের কথা। গ্রামবাসী মাত্রেই গরিব নয়; তাছাড়া স্বচ্ছল ব্যক্তির পক্ষে গরিব সাজা, বা শহরবাসীর পক্ষে গ্রামবাসী সাজার উপায়ের অভাব নেই। এইসব উপায় অবলম্বন করতে এগিয়ে আসবে গরীবিয়ানার ধ্বজাধারী সুযোগসন্ধানী উঠতি উচ্চবিত্তের দল।

মডেল স্কুলে শিক্ষালাভ যে অতিমাত্রায় লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে। শুধু লেখাপড়া নয়, থাকা-খাওয়া-পরা-যাতায়াত সবই যোগাবেন সরকার। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনেও এ-সব স্কুলের ছাত্রেরা প্রকটভাবে না হলেও উহ্যভাবে নিশ্চয় কিছুটা সুবিধা পাবে। এমন উদার ব্যবস্থার সুযোগ নিতে কচি ছেলেমেয়েদের ঘিরে একটা অশালীন কাড়াকাড়ি পড়তে বাধ্য। সন্তানকে দুধেভাতে রাখার জন্য আমাদের সমাজের বিপুলসংখ্যক অভিভাবক নির্দ্বিধায় মিথ্যা ও দুর্নীতির আশ্রয় নেন। নিজের আয়, সন্তানের বয়স, হস্টেলের প্রশ্ন উঠলে

বাড়ির ঠিকানা—এ-সব নিয়ে মিথ্যা বলা, বা ছেলেমেয়েদের মিথ্যা বলতে শেখানো, তো পারিবারিক কর্তব্য বলে গণ্য। এজন্য প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটও মন্ত্রবলে জোগাড় হয়ে যায়। আশঙ্কা হয়, মডেল স্কুলে ভর্তির জন্য মিথ্যাচার, স্বজনপোষণ, প্রভাব বিস্তার ও খেয়োখেয়ির একটা মহোৎসব শুরু হবে।

আরও উঁচু স্তরে, সদিচ্ছা থাকলে মেধার ভিত্তিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা ভাবা যায়—যেমন বহুলাংশে সম্ভব হচ্ছে জয়েণ্ট এন্ট্রান্সে, আই আই টি প্রবেশিকায়, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির পরীক্ষায়। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর পর পরীক্ষা নিলে, বহু ছেলেমেয়ে (বিশেষতঃ গরিব ছেলেমেয়ে) যেমন বাতিল হয়ে যাবে, তেমনি প্রায় এক যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে পাশ ও করবে বহু। শেষ বাছাইয়ের সময়ে নানা অশুভ শক্তির বিস্তার প্রায় অবশ্যম্ভাবী। বলা যেতে পারে, এ তো রূপায়ণের ত্রুটি, পরিকল্পনার নয়। কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যেই এই মারাত্মক ত্রুটি অন্তর্নিহিত রয়েছে।

শেষ এবং সার প্রশ্ন : যদি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মডেল স্কুলগুলি সত্যিই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তাহলেও কি তারা আদর্শ শিক্ষার্থী, আদর্শ নাগরিক গড়তে পারবে ? এ যাবৎ যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে কিন্তু মনে হয় এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের তরিয়ে দেওয়া, উৎরিয়ে দেওয়া, জনজীবনের লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতির পথ দেখিয়ে দেওয়ার একটা ধারার প্রবর্তন হবে।

স্কুলগুলি হবে আবাসিক। জেলায় মাত্র একটি স্কুল থাকলে এ ছাড়া উপায় নেই। আবাসিক স্কুলের স্বপক্ষে নানা যুক্তিও দেখানো যায়। কিন্তু এর ফলে গৃহের সঙ্গে, গ্রামের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যোগ কিছুটা আলগা হতে বাধ্য, কর্মশিক্ষা ও গ্রামসেবার যাই ব্যবস্থা থাকুক না কেন। গ্রামের ছেলের শহরে আসা, গরীব ছেলের উন্নতির সুযোগ, অবহেলিত ছেলের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন—এ-সবের মধ্যে যেমন মর্মস্পর্শী আশা ও উৎসাহের উপকরণ থাকে, তেমনি নিজের উৎসের বিষয়ে বিস্মৃতি বা অবজ্ঞা, সামাজিক বন্ধনের প্রতি একটা উদ্ধত বেপরোয়া ভাব, একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রয়াসের একটা প্রবণতাও দেখা যায়। সম্প্রতি নানা কারণে আমাদের সমাজে যেনতেন প্রকারেণ চটকদার সাফল্য, কনসিউমারিস্ট ভোগবিলাসের হাতছানি একটা ঠুনকো আত্মসর্বস্বতার প্রকোপ বেড়ে গিয়েছে। সন্দেহ হয়, মডেল স্কুলগুলি এই মানসিকতার প্রভাবে সৃষ্টি হতে চলেছে, পোষাকী উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। এগুলির কল্যাণে বহু উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত ও মুষ্টিমেয় দরিদ্রের সন্তানের পক্ষে ব্যক্তিগত সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথ সুগম হবে নিশ্চয়। স্বচ্ছল ঘরের সন্তানের অভিজাত স্কুলগুলিতে যে অসুস্থ উচ্চাভিলাষ ও প্রতিযোগিতা আজ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আর একটু সাধারণ স্তরে সেই একই প্রবণতা প্রতিফলিত ও লালিত করবে মডেল স্কুলগুলি। কিছু উপকারী, এমনকি আদর্শবাদী ছাত্র অবশ্যই বেরোবে, বাকিরাও অলক্ষ্যে অজান্তে দেশের কিছু উপকার করে বসবে। মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান ছাত্র বিদেশ যাবে, বিশ্বের গুণীসমাজে স্থান জয় করবে—যা দেশে থাকলে সত্যিই তারা পারত না। আরও অনেকে বিদেশ পাড়ি দেবে উচ্চবেতনে নিম্নপদে রাংতামোড়া ঘানি ঠেলতে, তাতে আমাদের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার কিছু বাড়বে। এই বিক্ষিপ্ত পুণ্যক্রিয়ার বেশী কিছু হবে কি ?

অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে এই গোছের চেষ্টা তো স্বাধীনতার পর থেকেই চলছে। নব্য দেশসেবকবাহিনী গড়ার জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার কত কেন্দ্র খুলেছে, ব্যয়বহুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বসিয়ে বহু আঁকজোক কষে সেখানে গ্রামের গরিব ছাত্রের হিসাব খাড়া করা হয়েছে। এত আয়োজন যে সম্পূর্ণ বৃথা যায়নি, আজকের ভারতের নানাবিধ অগ্রগতি তার প্রমাণ। কিন্তু প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই আরও কত কী হ'তে পারত' হয়নি, যা হয়েছে তারও উপযুক্ত আর্থনীতিক প্রতিফলন সমাজে ঘটেনি।

এর বড় কারণ, এই কর্মকাণ্ডের জন্য যাঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য বরাবরই রয়ে

গিয়েছে অতিরিক্ত, অসুস্থ মাত্রার আত্মকেন্দ্রিক। এঁরা গ্রাম ছেড়ে শহরে, কারখানা ছেড়ে অফিসে ছুটেছেন, গ্রীণ কার্ড আর জব ভাউচারের জন্য কাতার দিয়েছেন। যেখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সমাজের সর্বস্তরে এই মনোবৃত্তি কমছে না বরং বাড়ছে, সেখানে মডেল স্কুলের ছেলেমেয়েরা অন্যদিকে চলবে কোন প্রভাবে? এর দোষ কেবল সরকারের নয়, আমাদের সকলের ঃ দেশের উপযুক্ত কোনও শিক্ষাব্যবস্থা বানচাল করতে দলমত-নির্বিশেষে দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ যত্নবান। মডেল স্কুলের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হবার কারণ, তার কাঠামোর মধ্যে এই একই অসুস্থ প্রবণতার বীজ লুকিয়ে আছে।

"Challenge of Education" প্রস্তাবপত্রটি যখন ১৯৮৫-তে প্রকাশিত হয়, আমরা অনেকেই আশান্বিত হয়েছিলাম, কারণ বর্তমান ব্যবস্থা ও মনোবৃত্তির বাস্তবমুখী সমালোচনার সঙ্গে যথার্থ উপকারী ও সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি উৎসাহের যথেষ্ট ইঙ্গিত তাতে ছিল। তারপর ১৯৮৬-তে নতুন শিক্ষানীতির পাকা ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তার কর্মসূচী বা "Programme of Action"-ও রচিত হয়েছে। তাতে আরও কিছু-কিছু হিতকারী প্রস্তাব আছে, যেমন দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য "Operation Blackboard"। এইসব প্রস্তাব রূপায়ণের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। সর্বাঙ্গীন শিশু-বিকাশ প্রকল্পের (Integrated Child Development Scheme) অগ্রগতি এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম, সর্বত্রই প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। সবচেয়ে লজ্জা ও চিন্তার বিষয়, সার্বজনীন সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা এখনও অলীক আশা।

এইসব ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করলে তবেই কিন্তু সত্যিকারের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। সেই পটভূমিকায় মডেল স্কুলগুলিও একটা ভিন্ন ধরনের সার্থকতা খুঁজে পাবে। কিন্তু সবার আগে এই প্রকল্পটি রূপায়িত করায় শুধু এটির সম্বন্ধে নয়, গোটা নতুন শিক্ষানীতির কার্যকর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

শিল্পে সমাজবাস্তবতা ও নান্দনিকতা

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

"অথচ মনন চায় বিদগ্ধ সভ্যতা নিষ্কম্প-নিবাত,
চায় এই অনিকেত অসম্পূর্ণ সমাজের এ শিকল
ছিন্ন হোক সত্তা চায় খণ্ডিত মনের গ্লানি, এ কলুষ
দীর্ণ, চূর্ণ ফেলে দিক অতলান্ত নীল ভঙ্গিল তরঙ্গে।

আর বিশ্বের মানবলোক সংহত করবে তার পেলব-পরুষ
—স্বার্থে আর স্বার্থের উত্তীর্ণ অর্থে; সৌন্দর্যে ত্রিভঙ্গে
এক বিশ্বে মন হবে শৃঙ্খলবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সংগীত।

আহা! তখনই তো শিল্প মুক্ত, শিল্পীগণ যোগীজনোচিত॥"

বিষ্ণু দে

ভূমিকার পরিবর্তে

সমাজবাস্তবতা ও নান্দনিকতাকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিদ্বেষী ধারণাদ্বয় বলে ভুল হবে, মনে হবে উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে এদের অবস্থান। কিন্তু এ দুয়ের সার্থক সম্মেলনেই গড়ে ওঠে মহৎ শিল্প, সকল শিল্পীর শিল্পকর্মে এ দুটো প্রযুক্ত হয় একে অন্যের অনুপূরক হিসেবে।

আবার, শিল্পী যেমন সামাজিক জীব, শিল্পরচনায় যেমন তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না বাস্তবতাকে তেমনই তিনি নান্দনিক বোধ সম্পন্ন এক সুকুমার সত্তা, কল্পনার ডানায় ভর করে তাঁকেও হয় উড়তে। তাই শিল্পীমন সবসময় শিল্পরচনার এই ধরাবাঁধা নিয়মটাকে (সমাজবাস্তবতা ও নান্দনিকতার সুষম মিশ্রণ) মানতে চায় না, কিছু সময়ের জন্যে তা হয়ে ওঠে ভীষণভাবে আবেগপ্রবণ! এই বিশেষ মানসিকাবস্থা শিল্পীর মনে জন্ম দেয় দু' ধরনের প্রতিক্রিয়ার। এক: তথাকথিত নান্দনিকতার ধারণাটাকে দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি চান সাইক্লোনের মত শিল্প করতে, তাঁর চিন্তন তখন তোলপাড় হতে থাকে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের 'রিয়েলিষ্টিক' তরঙ্গাঘাতে! আর দুই: নীরবতা দিয়ে তিনি শব্দোচ্চারণ করতে চান, তথাকথিত একঘেঁয়ে বাস্তবতাকে ভুলে ময়ূরের মত নেচে ওঠে তাঁর হৃদয়, 'রোমান্টিক' আনন্দানুভূতিকে তিনি সযত্নে লালন করেন বুকের মাঝে।

শিল্পের স্বরূপ

'শিল্পের স্বরূপ' বিতর্কের এক উপযুক্ত বিষয়। শিল্প বাস্তবিক? নান্দনিক? না এ দুয়ের সার্থক সংমিশ্রণ? শিল্পরস যদি সমাজবাস্তবতা ও নান্দনিকতার দ্রবীভূত রূপ হয়, তবে উভয়ের অনুপাত কত হলে ঐ দ্রবণ সম্পৃক্ত হয়ে সকল শিল্পসৃষ্টি করবে? বলাবাহুল্য, শিল্পীমন বিজ্ঞানের এইসব হিসেব মাথায় রেখে শিল্পরচনা করতে পারে না, তার হৃদয়াবেগে বিজ্ঞানচেতনাকে ছাপিয়ে যায় শিল্পানুভূতি। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যেভাবে মেঘ দেখেন, বেঞ্জামিন মোলোইস সেভাবে দেখেন না, কারণ বৈজ্ঞানিক আর শিল্পীর

দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। আবার, মনস্তাত্ত্বিক কারণেই সব শিল্পীর অনুভূতিও একরকম হয় না, কালিদাসের 'মেঘদূতম'-এর সঙ্গে শেলীর 'দ্য ক্লাউড'-এর তাই বিস্তর ফারাক।

পাবলো পিকাসোর মতে, 'শিল্প হল এমন এক মিথ্যে, যা সত্যিকে জানতে সাহায্য করে।' স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, মিথ্যে কি ? সম্ভবতঃ পিকাসো 'মিথ্যে' বলতে বোঝাতে চেয়েছেন আঙ্গিক বা প্রকাশ-কৌশলকে, যা মূর্ত হয় ছন্দে, রসে ; আর 'সত্যি' হল জীবনাদর্শ, যা শিল্পের ভিত্তিভূমি। অর্থাৎ নান্দনিক (মিথ্যে) আঙ্গিকে প্রকাশিত বাস্তবসম্মত যে (সত্যি) জীবনবোধ, তাকেই বলে শিল্প। শিল্প বাস্তব-জীবনের কৌশলযুক্ত অথচ যথাযথ প্রতিবিম্বন বলেই তা স্পর্শ করতে পারে মানুষ ও সমাজের সৃষ্টিশীল উদ্যমের সমগ্র অঙ্গনটাকে।

সমাজবাস্তবতা

সমাজবাস্তবতার ধারণা মূর্ত হয় কোন একটা যুগের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক সম্যক জ্ঞানে। এ যুগে সমাজবাস্তবতা হল : মানুষের দ্বারা মানুষশোষণ, ন্যায়-নীতি-সৌন্দর্যের ধুয়ো তুলে প্রতিনিয়ত সেগুলোকেই পদদলিত করা, লালিত্যের মোড়কে কদর্যতা, হাঁপিয়ে ওঠা সাধারণ মানুষের অস্থিরতা, হতাশা। এমন এক অবস্থায় শিল্পের ভূমিকা কি হবে ?

শিল্প মননক্রিয়া হলেও তা বস্তুনিরপেক্ষ নয়, একান্তভাবেই বস্তুসাপেক্ষ। শিল্পী সামাজিক পরিবেশের নিরস রিপোর্টার বা বাস্তবের হুবহু ফটোগ্রাফার নন, তিনি নান্দনিক বোধহীন বা ললিতকলা বিরোধীও নন ; কিন্তু, যে মুহূর্তে তিনি সমাজবদ্ধতা ব্যতিরেকে, বাস্তবজীবনের দায় এড়িয়ে ভাবলোকে শিল্পের উপকরণ খুঁজতে থাকবেন, তখন তাঁর সৃষ্ট শিল্পের 'নান্দনিকতা', 'লালিত্য' বা 'সৌন্দর্য' পরিণত হবে অলীক বিমূর্ত ধারণা আলেয়ায়।

শিল্প ও ধর্ম

বাস্তবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ধর্ম। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মকে কেন্দ্র করে বহু শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম ছিল শিল্পের অন্যতম প্রেরণা, উপাদান। অতীন্দ্রিয়ের ধারণা পুষ্ট করেছে শিল্পকে, শিল্প হয়ে উঠেছে দেবতার প্রতি মানুষের প্রার্থনার মাধ্যম। মধ্যযুগের শিল্পে ধর্মের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ধীরে ধীরে দেব-দেবী-ধর্মাচরণের পাশাপাশি শিল্পে চিত্রিত হল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, 'ফুল্লরার বারমাস্যা।' আরও পরে, মানুষ যখন ধর্মবিযুক্ত শিল্পের কথা ভাবতে শিখল, শিখল 'জীবনের জয়গান' গাইতে, তখন থেকেই শিল্পের দেবতার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল মানব।

আধুনিককালের শিল্পে ধর্মের প্রভাব প্রকট না হলেও প্রচ্ছন্ন। মানবজীবনের কোন সমস্যা যখনই দেখা দিচ্ছে শিল্পে, তা থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশিত হচ্ছে ধর্মে, আধ্যাত্মিকতায় ! সামাজিক অনাচার ঢাকতে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে কৌশলে প্রবিষ্ট হচ্ছে ধর্মীয় প্রশান্তি ! এই আধ্যাত্মিকতা অসুস্থতারই এক দিক।

শিল্প ও অশ্লীলতা

সমাজের পক্ষে যা অশালীন, অশোভন, তাই অশ্লীল। কিন্তু এই সংজ্ঞায় অশ্লীলতার পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা অশ্লীলতা বলতে বুঝব, নর-নারীর মধ্যেকার

সম্পর্কের বিকৃত উপস্থাপনাকে। আদিম প্রবৃত্তির সুড়সুড়িতে সুস্থ সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটাতে শিল্পীর তেমন দক্ষতা বা মুন্সিয়ানার দরকার হয় না। 'বাস্তবকে সঠিকভাবে তুলে ধরছি', 'সত্যিকে নগ্নভাবে বলার সাহস রাখি'—এইরকম উত্তেজক কথা-বার্তায় তৈরী হয় অজুহাতের পথ।

বাস্তব সুস্থতা আর অসুস্থতার সংমিশ্রণে তৈরী ; অসুস্থতাই বাস্তব নয়, প্রেম-প্রীতির সম্পর্কটাও বাস্তব। অসুস্থ বাস্তবের ছবি আঁকতে চাইলে এমনভাবে তা চিত্রিত হওয়া উচিত, যা হবে অসুস্থতা দূর করার এক সবল পদক্ষেপণ। অশ্লীলতাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখানো হলেও তা সামাজিক অসুস্থতার কারণ নয় ফল। কারণটিকে দূর করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই ফলটাও দূর হবে। কোন শব্দকে 'অশ্লীল' বলে চিহ্নিত করাটাও ঠিক নয়। সেই বিশেষ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে তার শ্লীলতা-অশ্লীলতা। এই প্রয়োগের ব্যাপারটা আবার শিল্পীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত।

শিল্প ও অর্থনীতি

শিল্প বাস্তবধর্মী বলে তার মধ্যে বাস্তবের সুস্থতা (প্রীতি, মমতা, মঙ্গলেচ্ছা, প্রফুল্লতা, আশা, অন্যায়ের বিরোধিতা ইত্যাদি) এবং অসুস্থতা (ভাববাদ, অশ্লীলতা, হতাশা, পরস্পরবিদ্বেষ, দুর্নীতি, কাপুরুষতা ইত্যাদি) দুইই ফুটে ওঠে। এসবের মুখ্য নিয়ন্ত্রক হল সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা। যে সমাজে উৎপাদনের উপকরণ-গুলোর মালিক মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে দেখা দেয় সম্পদের বণ্টনবৈষম্য ; আর্থিক কারণে নষ্ট হয়ে যায় সামাজিক ভারসাম্য, মানুষের মনও যায় বিষিয়ে।

এই অসুস্থ অর্থনীতির প্রভাব পড়ে শিল্পেও। শিল্পে জড়িয়ে পড়ে অস্থিরতা, বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, আধ্যাত্মিকতা বা যৌনতা। সচেতন শিল্পীর তখন একমাত্র কর্তব্য হয়ঃ অসুস্থতার অবলুপ্তির জন্যেই অসুস্থতাকে বারবার তুলে ধরা, সুপ্ত মানবিক মূল্যবোধগুলোকে জাগিয়ে তুলতে সমাজের সুস্থ দিকটির প্রতি আলোকপাত করা, সঠিক জীবনবোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার শরীক হওয়া। শিল্প আর নিরপেক্ষ থাকতে পারে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুরু করে এক সাংস্কৃতিক যুদ্ধ, তুলি-কলম ঝলসে ওঠে হাতিয়ার হয়ে।

শিল্প ও রাজনীতি

রাজনীতি সমাসগত অর্থে 'নীতির রাজা', আমাদের জীবনে অনুসৃত নীতিগুলোর মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ, তারই নাম রাজনীতি। প্রচলিত ধারণানুযায়ী রাজনীতি হল রাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতি, এখানে রাজনীতিকে আমরা সেই অর্থেই প্রযুক্ত করব। কোন দেশের রাষ্ট্রকাঠামো সে দেশের শিল্পের ওপর প্রভূত পরিমাণে প্রভাব ফেলে। পূর্বোক্ত 'অসুস্থ অর্থনীতি'র প্রবক্তারা যে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকবেন, সেখানকার শিল্প হয়ে পড়বে জীবনবিমুখ, জীবনের বিশ্লেষণ করবে বিজ্ঞানের সমান্তরালে। যে শিল্পী নির্ভীকভাবে শেকলভাঙ্গার গান গাইবেন কার্যকরী পথে রাষ্ট্রকাঠামোর গুণগত পরিবর্তন চাইবেন, তাঁর ওপর নেমে আসবে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন!

অন্যদিকে, রাষ্ট্রক্ষমতা বণ্ডিতের করায়ত্বে থাকলে বিকাশ ঘটে স্বাধীন শিল্পের, বাস্তববর্জিত অলীক সৌন্দর্য নয়, সম্যক জীবনবোধে সমাজসম্মত নান্দনিকতাই প্রতীয়মান হয়। সেখানে, বিকশিত হতে পারে 'শতফুল।' অসুস্থ অর্থনীতির মত অসুস্থ রাজনীতিও শুধু আদর্শ জীবন-যাপনের পক্ষেই নয়, সৎ শিল্পের পুষ্টিরও প্রতিকূল। একমাত্র সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশেই মানসিক গুণ ও সুকুমার বৃত্তিগুলো জাগরূক হতে পারে, কেবল সেখানেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টিধর্মী শিল্প সম্ভব। বলাবাহুল্য, কোনভাবেই শিল্পকে রাজনীতিবর্জিত করা যায় না।

শিল্প ও শ্রেণী

শিল্পী সামাজিক জীব, শিল্পের মূল বাস্তবে, তাই সামাজিক ও বাস্তবিক সমস্যাগুলো প্রতিফলিত হয় শিল্পেও। অর্থনীতি ও রাজনীতির অসুস্থতায় মানুষের মধ্যে দেখা দেয় শ্রেণীবিভাগ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্পকে হতে হয় এক বিচিত্র সমস্যার মুখোমুখি.....

ধনবৈষম্যে, রাজনৈতিক প্রহসনে গোটা সমাজটা ভাগ হয়ে যায় দুটো শিবিরে, বঞ্চিত আর সঞ্চিতের পার্থক্যরেখাটা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে প্রভাবিত হয় শিল্পীর জীবনদর্শন, মানসিকতা, ভাবাবেগ। 'অবিমিশ্র নান্দনিকতা'কে সমাজের কোথাও খুঁজে না পেয়ে শিল্পী পড়েন দ্বন্দ্বে, একদিকে তিনি সুন্দরের পূজারী, কলারসিক, অন্যদিকে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে—একশ্রেণীর রক্ত-অশ্রু ঘামে অন্য শ্রেণীর অমানবিক মুনাফাবৃত্তির ছবি! 'জ্যোৎস্না সমুদ্রের তরী' চাঁদকেও গোল হলে ঝলসানো রুটি আর বাঁকানো হলে শানানো কাস্তে ছাড়া তখন তিনি আর অন্য কিছু ভাবতে পারেন না। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, সচেতন বা অবচেতনভাবে তিনি যে কোন একটা শ্রেণীর জন্যে শিল্প করতে বাধ্য হন।

নান্দনিকতা

এতক্ষণ আলোচনাটা যেভাবে এগোল, তা থেকে মনে হতে পারে যে, এই অসুস্থ বাস্তবজীবনে, কদর্য সমাজে ললিতকলা চর্চাটা অসম্ভব বা অনুচিত। কিন্তু খাওয়া, ঘুম, আন্দোলন বা জননের মতই সৃষ্টিশীলতাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, আর শিল্প যেমন সৃষ্টিশীল, তেমনই সুন্দর। প্রত্যেক মানুষই কমবেশী নন্দনতাত্ত্বিক। অনেকে নান্দনিকতাকে 'সমাজ ব্যতিরিক্ত এক বাস্তবোর্দ্ধ অনুভূতি' হিসেবে মনে করেন। সুন্দরকে তাঁরা 'বিশুদ্ধ' বা 'অবিমিশ্র' আখ্যা দিয়েই সন্তুষ্ট। তাঁদের মতে ঃ সুন্দরের বিকাশ সৌন্দর্যেই, সেখানে জ্ঞান-সংস্কার-আনন্দের চেয়ে প্রকাশের ভূমিকাই বেশী। সৌন্দর্যবোধ স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ এক শৈল্পিক মনোবৃত্তি। অনেকে আবাব সৌন্দর্য বা নান্দনিকতাকে দেখেন আধ্যাত্মিক বোধ হিসেবেও।

সৌন্দর্য কিন্তু একেবারেই এরকম নয়। পরিবর্তনশীল জগতের অন্যসব বস্তুর মত সৌন্দর্যানুভূতিও অনিত্য, সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে তা বিশ্লেষিত হয় নতুন নতুনভাবে। সৌন্দর্য তাই একান্তভাবেই যুগনির্ভর, বস্তুগত। নান্দনিকতা কখনোই মানুষ থেকে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ নয়। 'সমাজোর্দ্ধ' নান্দনিকতা কৌশলে প্রশ্রয় দেয় সামাজিক কুশ্রিতাকে, প্রকৃত নান্দনিকতার সঙ্গে সুস্থ মূল্যবোধের কোন বিরোধই নেই।

শিল্প ও নীতি

শিল্পের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। শুধু রূপসৃষ্টি করে আনন্দদানই শিল্পের উদ্দেশ্য নয়, শিল্পে আছে এক জ্ঞানীয় দিক—জগত সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে সঠিক ও সুগভীর জ্ঞান দান। নান্দনিকতাকে যাঁরা বাস্তববর্জিত বলে থাকেন, শিল্পের সেই প্রকাশবাদীরা এড়িয়ে যান নৈতিক প্রশ্নকে। অন্যদিকে, বিষয়বাদীদের শিল্পে মূল হয়ে ওঠে নীতিবোধ।

নান্দনিকতার মত নৈতিকতাকেও যাঁরা সমাজ বিচ্ছিন্ন শাশ্বতবোধ বলে মনে করেন, তাঁদের ব্যাখ্যায় লুকিয়ে থাকে ভাববাদের বীজ। অনিত্য এই জগতের কি নান্দনিক কি নৈতিক—সব বোধই যুগধর্মানুযায়ী নিয়ত পরিবর্তনশীল। নৈতিকতার ধারণা উঠে আসে সমাজ থেকে, বাস্তবজীবন থেকে। অসুস্থ ব্যবস্থায় মমতা, প্রীতি, শান্তি, সমাজসেবা—এই কথাগুলো সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত হতে পারে না, অবস্থাটাকে না পাল্টানো পর্যন্ত। অমানবিক অর্থনীতির প্রভাব পড়ে সামাজিক নীতিবোধেও, অনৈতিকেরাই আগে থেকে অবাস্তব, অমূর্ত নীতিশাস্ত্রের দোহাই পেড়ে সাধারণকে প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনে শিক্ষিত করার চেষ্টা চালান। নান্দনিকতার

পাশাপাশি শিল্পে থাকা চাই নৈতিকতা, যে নৈতিকতা হবে আত্মশুদ্ধি ঘটাতে প্রয়াসী, সমাজবিজ্ঞানের গতির অভিসারী পরিবর্তিত সংজ্ঞার নীতিবোধ!

শিল্প ও যুক্তি

নান্দনিকতা ও নৈতিকতা কতটা বাস্তবসম্মত, কোন শিল্পে এ দুটো কতটা সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, তার বিচার করতে হয় যুক্তির পথেই। অনেকে বলেন, 'শিল্পে আবার যুক্তির কচকচানি কেন? শিল্পিতবোধ যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না।' আমরা জানি, শিল্প জীবনধর্মী, তাই যে শিল্পের বিষয়বস্তু যৌক্তিক নয়, তার উদ্দেশ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট। কেননা, শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হল মানবসমাজের মঙ্গলসাধন, শৈল্পিক উপায়ে জীবনের অসংগতিগুলোকে দূর করা। এই 'মঙ্গলসাধন' বা 'অসংগতি দূরীকরণ' অবিচ্ছেদ্যভাবেই যুক্তিনির্ভর। কোন কাজটা মঙ্গলকর, কিভাবে অসংগতি দূর করা যায়, তার বিশ্লেষণ হয় যুক্তি মেনেই।

সৌন্দর্যবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান এবং যুক্তিবিজ্ঞান—এ তিন আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের আলোচনা দর্শনশাস্ত্রের কাজ। কিন্তু এদের আলোতেই ধরা পড়ে শিল্পেরও আদর্শ! শিল্প সত্যি, শিব, সুন্দর। এ জীবনে সত্যি কি? 'সত্যি' হল যৌক্তিকতা, যুক্তির পথ ধরেই প্রতিষ্ঠা করতে হয় সত্যির। মানুষের পক্ষে যা কিছু মঙ্গলকর, তাই 'শিব', শিব এখানে ঈশ্বর নয়, নীতিবোধ। 'সুন্দর' বা নান্দনিকতাও বাস্তববহির্ভূত কোন অনুভূতি নয়, তা মূর্ত হয় সমাজজীবনেই।

শিল্প ও প্রকাশকৌশল

শিল্প হল এক ধরনের মানসিক রসানুভূতি, যা গড়ে ওঠে সামাজিক ঘটনাবলীর স্রোতে আর প্রকাশযোগ্য হয় আঙ্গিকের কলাকৌশলে। সক্রেটিসের শিষ্য ও অ্যারিস্টটলের গুরু গ্রীক দার্শনিক প্লেটো থেকে শুরু করে আজকের দিনের বহু ভাববাদী শিল্পীই জোর দেন প্রকাশকৌশলের ওপর। অসম্বদ্ধ, অস্পষ্ট বস্তুজগতের ধারণা আমাদের মনে সংবেদিত হয় মানসিক প্রকরণে, মানসিক প্রকরণ আবার রূপ নেয় আঙ্গিকে। শিল্পে বিষয়বস্তুর চেয়ে আঙ্গিককে তাই অনেকে বড় করে দেখান, শিল্পকে ঘোষণা করেন প্রকাশধর্মী হিসেবে।

সকলের ভাবনাই অবশ্যই এমনটা নয়। বিষয় ও আঙ্গিকে সূক্ষ্মতর পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ এরা অবিচ্ছেদ্য। বিষয় বাস্তবের প্রতিবিম্বন, আঙ্গিক বিষয়ের দর্পণ। 'কি প্রকাশ পাচ্ছে'—এই ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই 'কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছে'র ওপর জোর দেওয়া হয়। অযোগ্য আঙ্গিকে যেমন মূল্যবান বিষয়বস্তু সঠিকভাবে প্রতিভাত হয় না, তেমনই বস্তাপচা বিষয়ের প্রকাশরীতি সুন্দর হলেও সার্থক শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। আকার (বা আঙ্গিক) বিষয়ের যান্ত্রিক প্রকাশপদ্ধতি নয়, স্বচ্ছ ধারক।

শিল্প ও দ্বান্দ্বিকতা

বস্তুগত বিকাশ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বিপ্লবী দার্শনিক কার্ল মার্কস, অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের মতই মনে করতেন: জাগতিক সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই তার বিরুদ্ধ গুণ লুকিয়ে থাকে এবং এ দুয়ের সংঘর্ষেই সংশ্লেষিত হয় নতুন বিষয়। মার্কস হেগেলের মত এই দ্বন্দ্বের পেছনে অতীন্দ্রিয় কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার না করেই দেখান: 'বাদে'র থাকে 'বিবাদ', সংশ্লেষ ঘটে 'সম্বাদে', কিছুদিন পর 'সম্বাদ' পরিণত হয় 'বাদে' আবার দেখা যায় 'বিবাদ'.....শিল্পবিষয়ক আমাদের এই পর্যালোচনাও চিন্তার এক বিশেষ ধারাপ্রসূত, এই ধারার আবার বিরুদ্ধ ধারাও আছে, সংঘর্ষ ও সম্মেলনে জন্ম হবে আরেক উন্নততর ধারার।

শিল্পের সৃষ্টিশীলতাও এগিয়ে চলে 'অন্বয় অনন্বয় সমন্বয়ে'র পথে। সমাজবাস্তবতা ও নান্দনিকতার সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক, দুয়ের সংঘর্ষেই শিল্পের উৎকর্ষ। মূলতঃ অবিচ্ছেদ্য হলেও শিল্পের আকার ও বিষয়ের মধ্যেও রয়েছে দ্বান্দ্বিকতা।

শিল্প ও প্রকৃতি

যে জটিল সামাজিক ও মানসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শিল্পের জন্ম হয়েছে, তার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, একটা পর্যায়ে শিল্পসৃষ্টির প্রধান প্রেরণা প্রকৃতিই। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আদিম মানুষ ভয়ে লুকিয়েছে গুহায়, গুহাচিত্রে ফুটে উঠেছে 'প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম।' প্রকৃতিকে শুধু ভয়ই নয়, তার সঙ্গে মানুষ অনুভব করেছে একাত্মতাও। প্রকৃতির কোলে হেসেছে, খেলেছে, মনোমধ্যে বপন করেছে আনন্দানুভূতির বীজ। শিল্প গড়ে উঠেছে মানসিক সুখ-দুঃখ প্রকাশের প্রিয়তম এক অনুভূতিশীল মাধ্যম হয়ে। একদিকে প্রকৃতিকে ভালবাসা, অন্যদিকে তাকে জয় করবার দুর্দমনীয় ইচ্ছে—দুইই দেখা দিয়েছে শিল্পের অন্যতম উপাদান হিসেবে।

মানুষের রোমান্টিক বা নান্দনিক বোধও পুষ্টি পেয়েছে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই অচ্ছেদ্য বন্ধন বা অকৃত্রিম ভালবাসার সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত হয়েছে সমাজবদ্ধ জীবনেই। প্রকৃতিপ্রেমের পাশাপাশি তাই সমাজচেতনাও দেখা দিয়েছে মানবিক প্রবৃত্তি হিসেবে। প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠতা মূর্ত হয়েছে মানবচরিত্রের উষ্ণ সান্নিধ্যে, প্রকৃতিকে মানবায়িত করেছে মানুষই।

শিল্প ও যুগ

শিল্পের সঙ্গে যুগের সম্পর্ক কি হবে—এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। শিল্প কি যুগের অস্তিত্ব অস্বীকার করে অমরত্বের জয়টীকা পরে চিরস্থায়িত্বের পথে ধাবমানা? অথবা (নন্দন রসসিক্ত) যুগীয় পরিস্থিতিকে উপজীব্য করে রচিত হয় বলে শিল্প স্বাভাবিকভাবেই যুগাশ্রয়ী? শিল্পকে যাঁরা চিরস্থায়ী ভাবেন, তাঁদের মতে : শিল্পরস কোন কালের ভেদ মানে না, তার স্বাদ সর্বকালের, সর্বযুগের, দৃষ্টি যুগান্তরের পানে।

আমরা আগেই দেখেছি, পরিবর্তনশীল পৃথিবীর কোন বোধই চিরন্তন নয়। যুগে যুগে, কালে কালে তার সংজ্ঞা বদলাতে থাকে। 'যুগবর্জিত সৃষ্টিশীলতা' অলীক ধারণা মাত্র। যুগের আবর্তনেই শিল্পের বিবর্তন। বাস্তবের সমস্যাগুলোকে যে শিল্প যত বেশী ভালভাবে ধরতে পারে, তা মানুষের তত প্রিয় হয়ে ওঠে। আবার, সব যুগের সমস্যাও একরকম নয়, যুগধর্মকে অস্বীকার করে তাই আর যাই হোক জীবনধর্মী শিল্পরচনা সম্ভব নয়। কোন শিল্পের জনপ্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়ী কখনোই হতে পারে না। কোন 'শাশ্বত মূল্যবোধ' নয়, একটা যুগের জীবনাদর্শ বাস্তবসম্মতভাবে যদি কোন শিল্পে ব্যঞ্জিত হয় (শিল্প হয়ে ওঠার শর্তগুলোকে মেনে), তাকেই সফল শিল্প বলে মেনে নেওয়া উচিত।

শিল্পের জন্যে শিল্প

আচ্ছা, শিল্পের কি কোন উদ্দেশ্য আছে? অনেকের মতে নেই। কোন উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে নাকি শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। 'নিজের বিস্তারে নিজেরই আনন্দ—এছাড়া শিল্পের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, আত্মবিকাশে আত্মপ্রকাশই শিল্পের ধর্ম, জাগতিক কোন কিছুর জন্যেই শিল্প নয়, শিল্পের জন্যেই শিল্প'—এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে যাঁরা শিল্পের বিশ্লেষণ করেন, সেই কলাকৈবল্যবাদীদের মতে : শিল্প স্বাধীন, বাস্তব বা সমাজ বিচ্ছিন্ন, শ্রেণীস্বার্থের উর্দ্ধে অবস্থিত এক নান্দনিক বোধ।

কোনভাবেই এমতকে সমর্থন করা যায় না। শিল্প প্রভাবধর্মী; মানুষের মনে, সমাজের বুকে শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে বলে কিছুতেই তা বাস্তব বহির্ভূত নয়। শিল্পের এই প্রভাবধর্মী বৈশিষ্ট্যই শিল্পীকে

একটা পক্ষ নিতে বাধ্য করে, ন্যায় কিম্বা অন্যায়ের। শিল্পী সামাজিক জীব, তাই তাঁর একমাত্র দায়িত্ব হিসেবে দেখা দেয়ঃ সমাজকে, মানুষকে সৎভাবে প্রভাবিত করা। শিল্পিত বোধে মানবকল্যাণ সাধনই শিল্পের উদ্দেশ্য!

মানুষের জন্যে শিল্প

শিল্পীর নান্দনিক মানসিকতা মানবিক মূল্যবোধের বিরোধী নয়। শিল্পীও মানুষ, মানুষের প্রতি মানুষেরই থাকে সমাজগত এক আত্মিক বন্ধন। এই ভাবনাকে জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ করে যিনি শিল্প-রচনায় ব্রতী হন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সৃষ্ট শিল্প হয়ে ওঠে জীবনাভিসারী। মানুষের শুভবোধই জন্ম দিয়েছে শিল্পের, তারপর সুদীর্ঘ এক বিবর্তনের মাধ্যমে তা আজকের এই রূপপ্রাপ্ত, শিল্প তাই উদ্দেশ্যগতভাবে কখনোই অশুভ হতে পারে না।

শিল্পীর শুভবোধ ললিতরসে জারিত হয়ে জন্ম দেয় সুস্থ শিল্পের, মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরতে রামধনুর মত প্রযুক্ত হয় নন্দনতত্ত্ব। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী শিল্পে ফুটে ওঠে জীবনের প্রয়োজনে। যে সামাজিক কুশ্রিতা শিল্পিত মননের, উন্নত ভাবধারার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে পাহাড়ের মত, 'বোকাবুড়ো'র মত তাকে সর্বশক্তিতে সরানোর কাজেই নিয়োজিত হয় শিল্প; কেননা, আকাশছোঁয়া সেই পাহাড়ের ওপারেই সমস্ত রঙ-রস, 'রূপকথা-ফুল-নারী-নদী'! চোখের জলে লেখা, বুকের রক্তে আঁকা, জীবন যুদ্ধের ছবিই তো শিল্প!

উপসংহার এবং

এতক্ষণে, আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। এই পরিধিতে শিল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপটা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে কিনা জানিনা, তবে একান্তভাবেই চেষ্টা করা হয়েছে শিল্পে সমাজ বাস্তবতা ও নান্দনিকতার সম্পর্কটাকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে। দেখানো হয়েছে; সমাজের বাস্তবাবস্থার নান্দনিক (নীতি ও যুক্তি মেনে) উপস্থাপনই শিল্পের ভিত্তি, শিল্প একই সঙ্গে সামাজিক ও নান্দনিক। তুরস্কের তারকা নাজিম হিকমতের মতে, 'সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প, যা জীবন সম্পর্কে মিথ্যে ধারণা দেয় না।' সফল শিল্প তাই 'আটটা নটার সূর্যে'র মত উজ্জ্বল!

কুসুমে আজ বারুদের গন্ধ—সতর্ক হোন এ যুগের শিল্পীফৌজ। শিল্পের রস হোক জীবনধর্মী, ছন্দ হোক চলোর্মি, অলঙ্কার হোক গেরিলা যুদ্ধের কৌশল! শিল্পরসিকদের তৈরী থাকতে হবে অন্য ধারার, অন্য ধরনের শিল্পানুভূতিকে বরণ করে নিতে। শিল্পী নিয়োজিত থাকুন 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাতে জঞ্জাল।' পৃথিবী সন্তানসম্ভবা—নবজাতকের আগমণ ঘোষিত হোক উজ্জ্বল হাসি, উদ্দাম জীবন, উচ্ছল রোদে। রাতের বৃন্ত থেকে ফুটে উঠুক আলোকিত সকাল, শিল্প হোক 'রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ।' 'ইস্তাহারে দেয়ালে ষ্টেনসিলে/নিজের রক্ত অশ্রু হাড় দিয়ে কোলাজ পদ্ধতিতে' জন্ম নিক শিল্প!

আমাদের ভাবনাকেই 'উপসংহার' বলে দাবী করছি না, আমরা দর্শনকে চাপিয়ে দেবার দলে নই! সমাজের অন্যসব বিষয়ের মত শিল্পদর্শনও এগিয়ে চলে চিন্তার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে। আজকের উপসংহার কালকের সূচনা। তাই উপসংহার এবং.....

বিজ্ঞানশিক্ষা ঃ বিকল্প পথের খোঁজে

সুদীপ্ত সরস্বতী

বিজ্ঞানের প্রাণবন্ত শরীর কোথায় ?

বিজ্ঞানী হলডেন এক ভারতীয় বন্ধুর সাথে এদেশেরই কোথাও বিকেলে পায়চারি করছিলেন। কানে এলো সুর ক'রে পুরুষকণ্ঠের একটানা আবৃত্তি। মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে ভেবে হলডেন আবৃত্তিকারের মন্ত্র বা ধর্মীয় ছত্রগুলো সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলেন। উত্তরে বন্ধুটি জানালেন, ধর্মের নয়, বিজ্ঞানের ছত্র আবৃত্তি মন্ত্রোচ্চারণের মতো শোনাচ্ছে। স্তম্ভিত* হলডেন এবার গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনে নিশ্চিত হলেন, ছেলেটি ইংরেজি ভাষায় অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিন তৈরির পদ্ধতি বার বার আবৃত্তির মাধ্যমে স্মৃতিতে ধ'রে রাখছে।

হলডেন এরকম পুনরাবৃত্তির পদ্ধতিতে এগারোটি ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যক কবিতা স্মৃতিতে সঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞান কখনো এভাবে পড়েননি বা শেখেননি। তাই হয়ত তিনি অবাক হয়েছিলেন।

তবে আমরা, বিজ্ঞানের ভারতীয় ছাত্ররা নিশ্চয়ই ওপরের ঘটনায় অবাক হচ্ছি না। যেখানে বইয়ের পাতায় লেখা প্রস্তুতপ্রণালী অনুসরণ ক'রে ল্যাবরেটরিতে তৈরির মাধ্যমে শেখার সুযোগ নেই, অথচ পরীক্ষার খাতায় কয়েকটা মাত্র মিনিটের মধ্যে বেশ গুছিয়ে খুঁটিনাটিসহ অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিন তৈরির পদ্ধতি লিখতে পারলে ঐ উত্তরপিছু বরাদ্দ নম্বরের ষাট, সত্তর, আশি বা নব্বই শতাংশ পাওয়া যেতে পারে এবং এভাবে পাওয়া নম্বরের পরিমাণ দিয়ে ছাত্রের ট্যালেণ্ট বা মেধার পরিমাণ মাপা হয়, সেখানে সচিৎকারে হোক আর অচিৎকারেই হোক, পুনরাবৃত্তির পদ্ধতিতে মুখস্থ করা ছাড়া অন্য কোন্ পথে ছেলেটি মেধাবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে ?

যাঁরা বিজ্ঞানশিক্ষার চলতি কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে চান, তাঁরা হয়ত ভেবেছেন, এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগে এলোপাথাড়ি গাদা গাদা তথ্যের ক্যাপসুল গেলানোই বিজ্ঞান শেখানো। কিন্তু বিজ্ঞানের এই শিক্ষাকাঠামোয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চর্চার সুযোগ কতটা ? প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস !! প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এর কোনো স্বাদই যখন পাইনি, তখন দাদাদের স্কুলের ল্যাবরেটরিকে ভাবতাম ম্যাজিক শেখানোর ঘর। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে উপলব্ধি করলাম, এটা একটা নিপীড়নকক্ষ যেখানে "প্র্যাকটিক্যাল নামে একটা গর্ভযন্ত্রণা সইতে হয় আর 'রেজাল্ট' কিছুতেই বইয়ের মতো আসতে চায় না।"

---

* হলডেনের স্তম্ভিত হওয়ার কারণটা কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে বিজ্ঞান "শেখা" (অর্থাৎ না-শেখা) কেবল ভারতীয় ছাত্রদেরই বিধিলিপি নয়। হলডেনের জীবনের সিংহভাগ যেদেশে কেটেছে, সেই ব্রিটেনের শিক্ষার ওপর সেখানকারই শিক্ষাবিদদের মূল্যায়নমূলক লেখা থেকে [যেমন The Challenge of Education (1967)—Sir George Pickering] মনে হয়, সৌভাগ্যবান ব্যতিক্রম (যেমন হলডেন স্বয়ং) ছাড়া গড় অবস্থাটা সে দেশেও কাছাকাছিই। কাজেই, এব্যাপারে আমাদের বেদনার কারণ থাকলেও হীনমন্যতার কারণ নেই।

বিজ্ঞানশিক্ষার এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের চোখের আয়নায় বা বইয়ের ছাপা অক্ষরে ঘটনার বন্যা দেখতে দেখতে ছাত্র ধীরে ধীরে চারপাশের ঘটনা দেখার চোখ হারিয়ে ফেলে। শিক্ষকের কাছ থেকে আসা প্রশ্নের একমুখী তোড়ে ছাত্রের চারপাশ থেকে আসা প্রশ্ন ভেসে যায়। শিক্ষক বিজ্ঞান দান করেন, ছাত্র বিজ্ঞান গ্রহণে ব্যস্ত থাকে। ক্রমশ ছাত্র যন্ত্রে রূপান্তরিত হয় আর যন্ত্রী হন শিক্ষক। প্রকৃতির ইহলোক থেকে ছাত্রের উত্তরণ (?) ঘটে বিজ্ঞানের পরলোকে। শিক্ষার এই রাস্তা ছাত্রকে বিজ্ঞানে কৈবল্যলাভের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। "বিজ্ঞান সত্য, জগৎ মিথ্যা" ধরনের উপলব্ধিতে মন ভ'রে যাওয়া সম্ভব তুরীয় অবস্থায়। বিজ্ঞানের গরুর গাড়িতে বসানোর জন্য ঋষির মতো শান্ত সমাহিত কৈবল্যপ্রাপ্তদেরই তো দরকার!

প্রকৃতির রহস্যভেদের চেষ্টা নয়, বিজ্ঞানের রহস্যভেদ করতে করতেই কেটে গেল বিজ্ঞানশিক্ষার এতগুলো বছর। বিজ্ঞানের শরীর ভেবে এতদিন যার ওপর দিয়ে চোখ বুজে হেঁটে এসেছি, এখন তার বুকের কাছে এসে কোনো হৃৎস্পন্দন অনুভব করছি না, শ্বাস পড়তেও দেখছি না। আসলে বিজ্ঞানের শরীর নয়, খোলসের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছি। এই কাঠামোয় বিজ্ঞানের জীবন্ত শরীর খুঁজে পাচ্ছি না।...বিজ্ঞানের প্রাণবন্ত শরীর খুঁজছি।

খুঁজছি হয়ত সবাই। তবে আমাদের বেশির ভাগের কাছেই খোঁজা মানে ভাবা, সংশ্লিষ্ট বইপত্র পড়া, লেখা তৈরি করা, তর্কের তোড়ে সিগারেট নিভিয়ে ফেলা ; আবার ভাবা...। আমাদের ভাবনাচিন্তাগুলো মনের উঠোনেই থেকে যায়, সমাজের মাটিতে আর নেমে আসে না। তাই এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষায় বিকল্প পথের খোঁজে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হাতে না নিয়ে কেবল মধ্যপ্রদেশের হোশাঙ্গাবাদ জেলার গ্রাম্য সমাজের দিকে চোখ ফিরিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হয়।

হোশাঙ্গাবাদের অভিজ্ঞতা

মধ্যপ্রদেশের হোশাঙ্গাবাদ জেলার দুটো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ফ্রেণ্ডস রুরাল সেন্টার ও কিশোর ভারতী, গ্রাম্য এলাকায় স্কুলগামী ছোট ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান শেখানোর এক বিকল্প পথে পা বাড়ায় ১৯৭২ সালের মে মাসে। হোশাঙ্গাবাদ জেলার গ্রামগুলোর ষোলোটি মাধ্যমিক স্কুলের পড়ুয়াদের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর সরকারি অনুমোদন নিয়ে ওদের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮২ সালে ফ্রেণ্ডস রুরাল সেন্টার ও কিশোর ভারতী বিজ্ঞানশিক্ষার বিকল্প পদ্ধতির মশাল তুলে দেয় একলব্য নামে নবগঠিত একটি সংস্থার হাতে।

উদ্যোক্তাদের কর্মপদ্ধতিটা এরকম ঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের তাঁরা বিকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষিত করেন। আশা করা হয়, প্রশিক্ষণের শেষে নিজ নিজ স্কুলের ছাত্রদেরও শিক্ষকরা একইভাবে বিজ্ঞান শিখতে সাহায্য করবেন।

খবরদারির আবহাওয়ায় সমাজের আগাপাশতলা ছেয়ে আছে। সমাজের অঙ্গ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বভাবতই কর্তৃত্ববাদী বিষবাষ্প থেকে মুক্ত নয়। এ আবহাওয়ায় ছাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ করার বদলে দমিয়ে রাখতে, গুটিয়ে থাকতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একথা খেয়াল রেখে হোশাঙ্গাবাদে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের গোড়া থেকেই শিক্ষকদের কর্তৃত্বকারী, অবদমনকারী আবহাওয়ার বদলে খোলামেলা, স্বচ্ছন্দ বাতাবরণ তৈরির চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়।

খোলামেলা আবহাওয়ায় শুরু হয় বিজ্ঞান শেখানো।

বিজ্ঞানশিক্ষার চলতি পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইংরেজ কবি কিপলিংয়ের অনুসরণে সুভাষ গাঙ্গুলি লিখেছেন, এখানে

"Theoretical is Theoretical
Practical is Practical
The twaine shall never meet."

বিজ্ঞানের থিয়োরেটিক্যাল ক্লাসে সূত্র, সংজ্ঞা, খাপছাড়া নানান তথ্য মুখস্থ করানো হয় যার সাথে চারপাশের যোগ খুঁজে পাওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক সূত্রের সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে ঠাসা থাকে নানান অর্থ। সেই অর্থগুলো উপলব্ধি না ক'রে সূত্রটা বলতে পারা আর কোনো তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করা একই ব্যাপার। অথচ এই ব্যাপারটাই ঘটে প্রচলিত থিয়োরেটিক্যাল ক্লাসে। ছাত্রকে এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না ক'রে সূত্র "আয়ত্ব" করতে হয়। ফানেল দিয়ে মাথার ভেতর যান্ত্রিকভাবে তথ্য ঢেলে দেয়ার সাথে এই ক্লাসগুলোর তুলনা করা যেতে পারে।

নিচু ক্লাসে প্র্যাকটিক্যালের বালাই নেই। উঁচু ক্লাসে ছাত্ররা ল্যাবরেটরিতে প্রবেশাধিকার পেয়েই জটিল, খুব দামী (অতএব অতি সাবধানে ব্যবহার্য) যন্ত্রপাতির পাল্লায় পড়ে। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অতি সাবধানতা, জটিলতা আর মহিমার আড়ালে ঢাকা পড়ে বিজ্ঞানের সরলতা। প্রকৃতির রহস্যকে উন্মোচিত করা যার কাজ, সেই বিজ্ঞানই এভাবে রহস্যময়, দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে, রোজকার বাস্তবতা থেকে দূরে স'রে যেতে থাকে। বিজ্ঞানশিক্ষা হয়ে ওঠে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর একটা বোঝা ব'য়ে বেড়ানো।

অন্যদিকে হোশাঙ্গাবাদের বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সোচ্চার উপলব্ধি

"ম্যয়নে শুনা···ভুল গয়া
ম্যয়নে দেখা···য়াদ রহা
ম্যয়নে কর্‌কে দেখা···সমঝ গয়া।"

এই "কর্‌কে দেখা" অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখাই বিকল্প বিজ্ঞানশিক্ষার মর্মবস্তু। এখানে শুরুতে সংজ্ঞা, সূত্র এসব মুখস্থ করানোর ঝোঁক নেই। জ্ঞানের ঝর্ণাধারায় ছাত্রদের ধুয়ে দেয়ার বদলে শিক্ষক সাহায্যকারী ও পরিচালকের ভূমিকা পালন করেন। পরিবেশকেই এখানে বিজ্ঞান শেখার উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাঠচক্র শুরু হয় "পরিবেশ থেকে কিছু উপকরণ নিয়ে প্রায় খেলার ভঙ্গীতে নাড়াচাড়ার (অন্য কথায়, পরীক্ষার) মাধ্যমে"। পরীক্ষার সাজসরঞ্জামের বেশিরভাগই চেনাজানা, সহজসরল, ঘরোয়া আর সস্তা। যেমন, পলিথিনের বাটি, তুলো, সুতো, বেলুন এসব। দাম কম হওয়ার জন্যে প্রতিটি ছাত্রই নিজে হাতে ইচ্ছেমতো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে। সহজসরল হওয়ার জন্যে যন্ত্রপাতির সাথে ব্যবহারকারীর একটা নিবিড় সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। ফলে একঘেয়েমির বদলে সৃজনশীলতার বিকাশের অবকাশ মেলে। অনেক সময় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ছাত্ররাই উদ্ভাবন করে। যেমন, একসময় সুঁচের অভাবে পরীক্ষা আটকে যেতে বসে। সুঁচের বিকল্প হিসেবে এক ছাত্রের মাথায় বাবলা কাঁটা (ওখানকার গ্রামে যার ছড়াছড়ি) ব্যবহারের কথা আসে। এখন বাবলা কাঁটা ওখানে সুঁচের জায়গা তো নিয়েছেই, উপরন্তু নতুন কিছু পরীক্ষাও উদ্ভাবিত হয়েছে যেখানে বাবলা কাঁটা সুঁচের চেয়ে বেশি উপযোগী। যাই হোক, প্রতিটি শিক্ষার্থীই নিজে হাতে চেনাজানা সাজসরঞ্জামের সাহায্যে পরীক্ষা চালায়, ইন্দ্রিয় চালনার মাধ্যমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ চালিয়ে পর্যবেক্ষণ নথিভুক্ত করে। তারপর অন্যান্য ছাত্র এবং শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিজেরাই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন করতে, প্রশ্নের উত্তর নিজেদেরই পরীক্ষার মাধ্যমে খুঁজে নিতে, পর্যবেক্ষণ বা সাক্ষ্যপ্রমাণকে খতিয়ে দেখতে এবং নতুন পরিস্থিতি এলে বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করার প্রেরণা যোগান।

সংগঠকের ডায়েরী

হোশাঙ্গাবাদের বিজ্ঞান কর্মীদের ডায়েরি থেকে তুলে আনা যাক কিছু টুকরো ছবি।

শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের পাঠচক্রে এক শিক্ষক, যিনি কৃষকও, জানতে চাইলেন, "আচ্ছা, মাটিতে যে সার দেয়া হয়, তা পাতায় পৌঁছয় কি ক'রে ?" উত্তর খোঁজার জন্যে পরীক্ষার কথা ভাবা হোলো। একটা ছোট্ট সবুজ ডাল কেটে তার গোড়ার দিকটা লাল কালিতে ডুবিয়ে রাখা হোলো। আধঘণ্টা পরে পাতার

"শিরা"গুলোকে লাল হয়ে যেতে দেখা গেল। এই পর্যবেক্ষণের রাস্তা দিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উত্তরে পৌঁছনো হোলো। কিন্তু একজন শিক্ষক সন্দেহ প্রকাশ করলেন, "এমনও তো হতে পারে যে পাতার শিরাগুলো লাল হয়েছে লাল কালিতে ডোবানোর জন্যে নয়, বরং ডাল কাটার জন্যে। কাটার পর আপেলের কাটা জায়গাটা বাদামী হয়ে যেতে আমি দেখেছি।"

চলতি শিক্ষাপদ্ধতিতে এই সন্দেহকে সম্ভবত উপহাস ক'রে উড়িয়ে দেয়া হোতো। ফলে, উপহাসের পাত্র হওয়ার আশঙ্কায় আগামী দিনগুলোতে বহু প্রশ্ন মনের ভেতর চেপে রাখতে প্রশ্নকর্তা হয়ত অভ্যস্ত হয়ে যেতেন। কিন্তু এখানে তা হোলো না। বদলে উত্তপ্ত বিতর্ক চলল এই প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে। অবশেষে ঐ পরীক্ষাটা আবার করা হোলো—তবে পাশাপাশি একই রকমের আরেকটা ডাল কেটে রঙ না মেশানো জলে ডুবিয়ে রেখে। এভাবে "তুচ্ছ" প্রশ্নের চৌকাঠে ঠেকে কনট্রোল্‌ড এক্সপেরিমেণ্টের ধারণা শিক্ষার্থীদের চেতনার বৃত্তে প্রবেশ করল।

স্বাভাবিকভাবেই এরকম বাধাহীন স্বচ্ছন্দ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের কৌতূহলের জানালাটা খুলে যায়। প্রশ্ন আসে, "নীল কালি ব্যবহার করলে কী হবে?"

বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক তাঁর অজ্ঞতার কথা অকপটে স্বীকার ক'রে বললেন, "আসুন, ক'রে দেখি।"

"অ্যাঁ, আপনি না বোটানিতে পি, এইচ, ডি,?" হতভম্ব একজনের মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো।

আসলে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের মূল্যবোধেই বড় রকমের আঘাত লেগেছিল। কেননা, তাঁদের কাছে উচ্চতম ডিগ্রির অর্থ ছিল জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছনোর প্রমাণপত্র। কিন্তু এরকম নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল যে, সদা সর্বজ্ঞের ভান না ক'রেও শিক্ষক হয়ে থাকা যায়। বহু প্রশ্নের উত্তর ছাত্রকেই খুঁজে নিতে হয়, শিক্ষক তার হয়ে খুঁজে দিতে পারেন না। এই উপলব্ধি শিক্ষকনির্ভরতা থেকে স্বনির্ভরতায় উত্তরণের সোপান।

পাঠক্রমের নির্বাচন নয়, বিকাশ

এই বিকল্প বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্যোক্তারা মনে করেন, গ্রামের ছেলেমেয়েদের কী শেখানো হবে অর্থাৎ সিলেবাস কী হবে, শহুরে বিশেষজ্ঞদের কলম তা বেঁধে দেবে না। গ্রামের পরিবেশে শিক্ষক ও ছাত্রদের রোজকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পাঠক্রম বিকশিত (evolved) হবে। সেভাবেই বিকশিত হয়েছে এবং হচ্ছে হোশাঙ্গাবাদের বিজ্ঞান পাঠক্রম ও বইপত্র। হাতে কলমে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ এড়িয়ে ওসব বই পড়া সম্ভব নয়। ওতে কিভাবে পরীক্ষা করতে হবে, তা বলা আছে, পর্যবেক্ষণ লিখে রাখার নির্দেশ আছে আর আছে পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্যে দুয়েকটা প্রশ্ন। আলোচনার আরো প্রশ্ন আসবে। আলোচনার মাধ্যমে বা নতুন পরীক্ষার সাহায্যে উত্তর খুঁজে নিতে হবে ছাত্রদেরই। তারপর সিদ্ধান্ত খাতায় লিখে রাখতে হবে। হাজার খুঁজলেও বইয়ে কোনো সংজ্ঞা, বলে দেয়া পর্যবেক্ষণ বা তৈরি করা উত্তর মিলবে না।

পরীক্ষাব্যবস্থা

একবার একটা শহরের স্কুলে কিছু বিজ্ঞানকর্মী "করকে দেখা……সমঝ গয়া" নীতির ভিত্তিতে বিজ্ঞান শেখানো শুরু করেন। ছাত্ররাও উৎসাহিত। বিজ্ঞান মুখস্থ করার দিন চ'লে গেল। বেশ চলছিল। কিন্তু একসময় বোর্ডের পরীক্ষার গর্জন শোনা যেতে লাগল। একটা অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হোলো সবাইকে। ছাত্রদের মূল্যায়নের ধরনটা কিরকম হবে? বোর্ডের কর্মকর্তারা প্রথাগত পরীক্ষাপদ্ধতি থেকে একচুলও সরতে রাজি হলেন না। অগত্যা সম্ভাব্য প্রশ্নের তৈরি করা উত্তর গেলাতেই শেষের কয়েকটা মাস কাটল। বিকল্প বিজ্ঞানশিক্ষার উৎসাহ মাঠে মারা গেল।

তবে হোশাঙ্গাবাদের বিজ্ঞানকর্মীরা বেশ আটঘাট বেঁধেই মাঠে নেমেছিলেন। যে ষোলোটি স্কুলে এই বিকল্প বিজ্ঞানশিক্ষার চর্চা হচ্ছে, সেখানকার ছাত্রদের বিজ্ঞান বিষয়ে মূল্যায়নের পদ্ধতি স্বাধীনভাবে ঠিক করার সরকারি দায়িত্বে রয়েছেন উদ্যোক্তারাই। ব্যক্তিছাত্রের পর্যবেক্ষণক্ষমতা, পরিবেশ থেকে তথ্য আহরণের ক্ষমতা, স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করার ও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পারদর্শিতাই ওখানকার পরীক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়নের মাপকাঠি। তাছাড়া নতুন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হ'লে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে সমাধানসূত্র খুঁজে বের করার পারদর্শিতাও বিচার করা হয়। ওপ্‌ন্‌-বুক (open-book) লিখিত পরীক্ষা এবং হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে এসব যাচাই করা হয়। পুরোনো পরীক্ষার উত্তরপত্রের বিচারবিশ্লেষণের ভিত্তিতে নানা অদলবদলের মাধ্যমে ছাত্র মূল্যায়নের পদ্ধতিকে দিন দিন আরো উপযোগী ক'রে তোলা হচ্ছে।

উপসংহারের বদলে

বিজ্ঞানের ছাত্ররা যে পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করছি, আমরা সবাই নিশ্চয়ই সেটাকে পালটানোর পক্ষে। অবাঞ্ছিত এই শিক্ষাপদ্ধতির বিকল্পে বাঞ্ছনীয় পদ্ধতিতে বিজ্ঞানশিক্ষা যে স্কুলস্তরে সম্ভব, হোশাঙ্গাবাদের অভিজ্ঞতার আলোয় আজ তা স্পষ্ট। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও চলতি শিক্ষাপদ্ধতির বিকল্প কী হতে পারে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করা দরকার এখন থেকেই। একইসাথে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির শেকল ভাঙার আওয়াজ তুলতে হবে আমাদের। হোশাঙ্গাবাদ আমাদের উত্তপ্ত করুক।

ঋণস্বীকার

১। Science and Indian Culture (1965) : Is "Science" a Misnomer —J. B. S. Haldane

২। The Hoshangabad Vigyan—Delhi University Science Teaching Group, Friends Rural Centre & Kishore Bharati; Science Today, December 1977

৩। "কর্‌কে দেখা…সমঝ গয়া" ঃ একটি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শিবিরের কথা— —সুভাষ গাঙ্গুলি ; বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

৪। "কর্‌কে দেখা…সমঝ গয়া" ঃ আরো দু'চার কথা —সুভাষ গাঙ্গুলি ; বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, মার্চ-জুন ১৯৮৬

৫। সুভাষ গাঙ্গুলির অপ্রকাশিত লেখা।

তুলনামূলক

কৃত্তিবাস রায়

এবার বিতর্কিত বসন্তে তুমি এলে
বেলা-ভোর বৃষ্টি হয়েছিল
নাগরিক বাগান-বাড়ির ছাদ ভরে গেল কোমল সবুজে
আর মনে পড়ল আমাদের পিতৃহীন গৃহযুদ্ধের কথা
এবং তোমাকে মনে হল অস্পষ্টবাদিনী
কি করুণ পূর্ণিমার নীল চাঁদ
ঝরে পড়ল পরিচিতি-হীন
অন্ধকার অবয়বে, ক্লান্ত, নিরক্ত অথবা, ব্যর্থ বাসন্তিক
বৃষ্টিতে আসার বাগান ভরে গেল
জল-কাদা, কখনও তোমার পদচ্ছাপে
কাঠের সিঁড়িতে তার স্মৃতি, তোমার দয়ায়
কবে প্রায় তুলনামূলক ?

অভিজিৎ দত্তর কবিতা

তোমারও সুদূর স্থিতি উপত্যকা জুড়ে যদি
প্রবর্তনা করো এক পাইন সবুজ রঙ
স্থির কোন যাদুর আভায় দ্যাখো অন্যমনা

কৌতুকে মাখামাখি অতর্কিতে নেমে আসে
ভ্রমর বিকেল তার নিজের সাথেই খেলা
নিজেদের সামর্থ্য মতো তারা নিজেই আলাদা

প্রাণপণ ফিরে যাবো জ্যোতির্ময় ক্যাকটাসের বনে
বয়স পালটে এক অগোচর রৌদ্র সভ্যতায়
তার কিনার ছুঁয়ে-না-ছুঁয়ে সুরেলা আমোদ

তোমার আঙ্গিকে এই আরেক সবুজে আমি
সামিল হয়েছি খুব সহজেই ছায়া আর রোদে
দুভাগে সাজিয়ে নিলে একমাত্র বর্ণ সঙ্গতি

যশোধরা রায়চৌধুরীর কবিতা

রসিয়া, তোমার রস কোথা হে ?
মুখের সামনে উড়ছে মাছি
পালঙক্ষেতের জন্যে এখন
হন্যে হয়ে আমরা বাঁচি

খরায় খরায় মারছ সবুজ
মরাই ভরে মানুষ তোলো
দোকানদারী ভাবের ঘরে
রসমাচানের দেখাও তো নেই

ডুবলো আলো, তবুও আছি
আকাশ চোখে হাপিত্যেশে
এখনও নেই প্রতিশ্রুত
সকল লোকই শিখছে ঠেকে

ঝলক ধোঁয়া মরিচ পোড়া
নাকের নীচে ধরছ এনে
বসাচ্ছো হাত, বুকের মধ্যে
দরদভরা ফিনকি টেনে
কথার পেরেক, কথার পাঁচিল
ভরপেটে তাই হই হা-ভাতে

চোখের পাতা জড়িয়ে ধরে
ফুলের নীচে ঘুমের সিরিঞ্জ
নীল মরণে, লাল ওজরে
স্বপ্ন সাজাও আয়না জুড়ে
কেমন করে প্রতিচ্ছায়া
মেনীমুখোর পলক দেখি

বলি হারি, রসিয়া তোমার
চোখের সামনে উড়ছে মাছি।

দুপুর

অদ্রীশ বিশ্বাস

একটা সিঁড়ি জাহাজ ভেঙে সমুদ্দুরে নামে
বাতাস ছেঁড়ে এই দুপুরে ডাইনে এবং বামে
ডেকের বুকে পায়ের চিহ্ন ভাসছে শত শত
নারীও নেই, কবিও নেই, শঙ্খচিলের মতো
কেবল কারো প্রেমের স্মৃতি গল্প করে যায়
তাতেই আরো তীরের তৃষ্ণা কাঁদছে পিপাসায়।

ঝড় তোলে বন্দী বাতাস

স্বপন রায়

দু'মুঠো বারুদ নিয়ে বাতাস দাঁড়িয়েছিল রাস্তার মোড়ে
তিনি ওয়ারলেসে খবর পেতেই
দমকলবাহিনীকে ডেকে পাঠালেন
বাতাস ভিজল, নিভল না বারুদের তাপ
তিনি তাই রাইফেলবাহিনীকে খবর দিলেন
গুলি চলল—
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল মাটিতে……

বন্দী বাতাস তবু ঝড় তোলে পুলিস পাহারায়।

কানুন

সৌম্য দাশগুপ্ত

চওড়া বানাও পথ, আমাদের আলাপ-আলোচনা হোক
জড়ো হয়ে এসো ঘরের দরজা, নিচু হয়ে যান লোক !

আঙুল উঠুক মাথার শীর্ষে, ধান গুনে নিক ওরা
চটুল ছন্দে ধুয়ে যাক বেদী, বেজে ওঠো গম্ভীরা

খুব কড়া হোক চায়ের লীকার, ফাত্‌না ভাসুক জলে
এক-গাঁ ঘরের মানুষ দাঁড়াক খড়ের মফস্বলে

বালি ধুয়ে নিক চোখের শলাকা, ঝাপ্‌টা লাগুক মুখে
কাঁধে তোলো ওকে সমবায়ীগণ, অস্থির কৌতুকে

খুব যদি হয় বেয়াড়া চিত্র, শূন্যে পাঠাও তুলি
চাবুকেও যদি না হয় সটান, চলুক চলুক গুলি !

মেঘের গল্প

দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ পালঙ্কে শুয়ে মেঘ তুমি আজীবন কার কথা ভাবো ?
মেঘ চেয়ে দ্যাখে নীচে রূপালি সূঁচের ফোঁড়ে বোনা হচ্ছে চিত্ররেখা নদী,
শাদা কল্কা শীর্ষে নিয়ে গড়ে উঠেছে শীতের দেশে পাংশুল পাহাড় ।

কার্পাসের ফ্রেমে বাঁধা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ধূসর চৌখুপি ঘিরে রুগ্ন মরুভূমি
সূঁচের রূপোলি টানে ছুটলে সঁপিল ট্রেন, ভেসে আসে তাৎক্ষণিক মুখরতা
দূষিত ধুলোর হাঁসফাঁসে সোনালী পঙ্ক্ষের ফাঁকে ঝরে আলো
—এরকম ভালোই চলছে পৃথিবী সেলাই ।

ঝাপ্‌সা বৃষ্টির রং ম্রিয়মান করে তোলে তন্তুময় বর্ণিল ইজেল
আকাশ পালঙ্কে শুয়ে মেঘ তুমি আজীবন কার কথা ভাবো ?
শস্যের জাজিমে দ্যাখো রেশ্‌মী আলোয় লেখা মেঘভাঙা হৃদয়-সংবাদ ।

হরিণী

বার্ণিক রায়

বুকের বনের মধ্যে চঞ্চল হরিণী
কখনো চকিতে দৌড়ে দেখা দিয়ে কোথায় পালিয়ে যায়
ঘন অরণ্যের ছায়া, অন্ধকারে দেখতে পাই না
আদিম পাতাল ভয়, বিদ্যুৎ চমকে ওঠে
বর্ষার নবীন পাতা হরিণী খাচ্ছে দাঁতে
আশেপাশে কেউ নেই তার ; ত্রাসে ভয়ে
আতঙ্কে চোখের পাতা কাঁপে দ্রুত স্নায়ুর মতন
একটু এগোলে শব্দে লাফিয়ে লাফিয়ে
চোখের বাইরে দূরে কোথায় হারিয়ে যায়
তাকে কী করে যে কাছে পাবো—আমার বুকের মধ্যে
হরিণের দীপ্ত হাসি খেলে যায় বিদ্যুতের রেখায় রেখায়,
আকাশে আকাশ মেঘে ছায়া করে আছে ॥

দেখা

শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

আমরা সাধারণতঃ বলি যে চোখে দেখি। কিন্তু, শুধু চোখে কি দেখা যায়? মনঃসংযোগ না থাকলে চোখের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ হলেও দেখা যায়না। সেজন্যই অনেক সময় কোন লোক কোন বিষয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কি দেখছ? সে উত্তরে বলে কিছুই না ত। এখানে তার চোখের সঙ্গে কোন বিষয়ের সম্বন্ধ হয়ত হয়েছে, কিন্তু মনঃসংযোগ নেই বলে সে সত্যিই দেখছে না। তা হলে বলা যায়, দেখার জন্য চোখও চাই, মনঃসংযোগও চাই।

কিন্তু, চোখ না থাকলেও শুধু মন দিয়ে দেখা যায় কি? অনেকেই বলেন, অন্ধের চোখ নেই বলে সাধারণভাবে সে দেখেনা; কিন্তু তার আছে মনশ্চক্ষু (inner eye), সে তা দিয়ে দেখতে পারে। অন্ধ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এ বিষয়ে তথ্যচিত্র তুলেছেন সত্যজিৎ রায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—অন্ধ কি সত্যিই দেখে? অনেকে বলবেন—অন্ধের দেখা কিছু লোকের কল্পনা। আবার অনেকে বলেন, আসলে অন্ধ মন দিয়ে ভাবে। ভাবনার গভীরতা এত স্পষ্টতা পায় যে তাতে একপ্রকার দর্শন হয়। এ-ই তার দেখা। এখানে স্বীকার করা হ'ল যে, মনের একপ্রকার ক্রিয়া বা মনন দর্শনে পরিণত হয়। তবে সব অন্ধই এমন দেখতে পারেনা। কারণ, সব অন্ধের গভীর মননের ক্ষমতা নেই।

'ধ্যানে দেখা' বলে একটি কথা আছে। সাধকেরা ধ্যানস্থ হয়ে অনেক কিছু দেখতে পান। সাধকেরা ধ্যানস্থ হয়ে অনেক কিছু দেখতে পান। সাধকেরা কি চোখ দিয়ে দেখেন? ধ্যানে দেখা আসলে মন দিয়ে দেখা। এতে অনেকে মনে করেন, শুধু মনঃসংযোগের সাহায্যে দেখা যায়। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব শুদ্ধ মনের গোচর।

মনের সাহায্য ছাড়া শুধু চোখ দেখতে পায়না, একথা মানতে বাধা নেই। আবার মনের সাহায্য চোখকে অনেক সময় বিপথে নিয়ে যায়। ফলে ভুল দেখি। কিন্তু, প্রথমেই ভুল দেখি বলে মনে করিনা। বরং বলি যা দেখি তা ভুল হয়না, নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কি করে? ফলে কলহের মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমরা অনেক সময় একটি বস্তুর স্থানে আর একটি বস্তু দেখি, অন্ধকারে দড়িকে দেখি সাপ। অনেকে বলেন, এই ভুল দেখার জন্য দায়ী ইন্দ্রিয়। চোখ আমাদের প্রতারণা করে। আবার অনেকে বলেন। চোখ প্রতারণা করেনা, আমরা চোখে ত সরু, লম্বা একটা কিছু দেখি, ব্যাখ্যা করার সময় 'এই কিছু'কে দড়ি না বলে বলি সাপ। তা হ'লে ভুল হচ্ছে মনের ব্যাখ্যার জন্য। অবশ্য অসুস্থ চোখ ভুল দেখাতে পারে। যেমন বর্ণান্ধ, ঠিক বর্ণ দেখেনা। তবে সুস্থ চোখ হলে দেখার ভুল হয় তা মনের ব্যাখ্যার জন্যই। কিন্তু, মুস্কিল এই যে, মনের ব্যাখ্যা ছাড়া দেখা অসম্ভব। তা হ'লে সমস্ত দেখার ক্ষেত্রেই ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই যদি অবস্থা—তবে যা দেখা যায় তা-ই বিশ্বাস করতে হ'বে—একথা বলা যায় কি?

মনের বিশেষ অবস্থার যেখানে কিছু নেই সেখানে লোকে কিছু দেখতে পারে। যেমন রাত্রিতে ভূতের গল্প পড়লে কেউ কেউ চোখের সামনে ভূত দেখে। ম্যাকবেথ শূন্যে ছুরি দেখেছিল। কোন কোন মানসিক রোগের ক্ষেত্রে নানা জিনিস দেখা যায় যা আসলে নেই।

আমরা অনেক সময় যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দেখি, ফলে পুরোটা না দেখার দোষ হয়। ধর্ম প্রগতি-বিরোধী যখন বলি, তখন যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্ম ক্ষতি করেছে তা-ই দেখি ; কিন্তু, ধর্ম যেখানে সমাজের উন্নতি করেছে তা দেখিনা। আসলে আমরা যে সিদ্ধান্ত করতে চাই সাধারণতঃ তার সমর্থক দৃষ্টান্ত দেখি ; বিরোধী দৃষ্টান্ত দেখিনা। ফলে দেখা হয় পক্ষপাতদুষ্ট।

যা-ই দেখিনা কেন তাতে সাধারণতঃ আমাদের পূর্বসংস্কার কাজ করে। সমস্ত পূর্বসংস্কার সম্পূর্ণ বর্জন করে দেখা আদৌ সম্ভব কি-না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, কুসংস্কার বর্জন করে মোহমুক্ত মন নিয়ে দেখলেই যথার্থ দেখা হয়। কিন্তু, কোন্‌টা কুসংস্কার সার কোন্‌টা সুসংস্কার তা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা কিভাবে সম্ভব ? এই নির্ধারণ শেষ পর্যন্ত ত মনই করবে। মন কি সমস্ত সংস্কার মুক্ত হতে পারে ? অনেকে বলেন, মনকে সংস্কারমুক্ত করা যায়, অবশ্য তার জন্য সাধনা দরকার। সে সাধনা সাধারণতঃ লোকে করে কি ?

আমরা সাধারণতঃ কোন না কোন উদ্দেশ্য নিয়ে দেখি। উদ্দেশ্যহীন দেখা অসম্ভব না হলেও নিষ্প্রয়োজন। অনেকে বলেন, তবে দেখা মানে উদ্দেশ্যে আসক্ত হয়ে দেখা ; নিরাসক্ত ভাবে দেখা সম্ভব নয় আবার অনেকে বলেন, উদ্দেশ্য নিয়ে দেখি বলেই নিরাসক্ত ভাবে দেখিনা, একথা বলা অযৌক্তিক। সত্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞানী যখন কোন কিছু দেখেন তখন কি তিনি নিরাসক্ত ন'ন ? নীচ প্রবৃত্তির দাস হয়ে কিছু করলে আসক্তি বোঝায়, অন্যত্র নিরাসক্তি।

যথার্থ দেখা অনেকান্ত, একান্ত নয়। বিভিন্ন স্থান বা দিক থেকে কোন একটি বস্তুকে দেখা যায়। ফলে যে কোন বস্তুরই অনেকান্ত রূপ প্রকাশ পায়। বস্তুর কোন একটি রূপকে একান্ত রূপ বলে মনে বা বা কোন একটি বিশেষ স্থান বা দিক থেকে দেখাকেই একান্ত সত্য বলে দাবী করা সমান দোষের। কিন্তু, আমরা প্রতিনিয়ত তা-ই করি। ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতির দিক থেকে দেখে প্রায়ই আমরা একান্ত সত্য দেখবার দাবী করি। ফলে অশান্তি ও বিড়ম্বনা।

বিশেষ অবস্থার জন্যও ভুল দেখা যায়। দূরের ঘুড়ি ছোট দেখায়, চলন্ত ট্রেনে বসে দুদিকের গাছপালা ছুটতে দেখি, সমান্তরাল রেললাইন দূরে মিলে গেছে বা আকাশ মিলেছে মাটির সঙ্গে দূরে, এসব ত আমরা রোজই দেখ্‌ছি। দুটি রেখা যদি দৈর্ঘ্যে সমান হয় তবে তবে উল্লম্ব রেখাটিকে শয়ান রেখার চেয়ে বড় দেখায় ; একটি কোণকে সমান দুভাগে ভাগ করে যদি কোন একটি ভাগকে আবার দুভাগ করা যায় তবে আবার ভাগ করা কোণটিকে অন্য কোণের চেয়ে বড় দেখি ; এমন ভুল দেখার সংখ্যা অনেক।

দেখা নানা রকম হতে পারে। দূর থেকে দেখা, কাছ থেকে দেখা ; ভেতর থেকে দেখা, বাইরে থেকে দেখা ; স্পষ্ট করে দেখা, অস্পষ্টভাবে দেখা ; বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যত্ন করে দেখা, সময় কাটাবার জন্য আলস্যভরা চোখে দেখা ; নিষ্ঠা নিয়ে দেখা ; হেলা ফেলা করে দেখা ; ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখা বা সামগ্রিকভাবে দেখা।

বিশেষ যত্ন করে নিষ্ঠা নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখা পরা ও অপরাবিদ্যার ভিত্তি। ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য তত্ত্ব সাক্ষাৎকার বা সত্যদর্শন। সুতরাং দেখা কিছু তুচ্ছ নয়।

তবে দেখা মানেই কি ভেবে দেখা ? দেখা যেখানে কেবলমাত্র সংবেদন (sensation), সেখানে ভাবনা, চিন্তা নেই। এই দেখা ভেবে দেখা নয়, কিন্তু দেখা যেখানে প্রত্যক্ষ (perception) সেখানে ভাবনা,

চিন্তা অবশ্যই থাকে। যখন রঙ দেখি যখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে রঙের সন্নিকর্ষ হয়, সেই মুহূর্তে সংবেদন। সেখানে রঙ্‌কে রঙ্‌ বলে জানিনা। যখন সন্নিকর্ষের ফলে রঙ্‌কে রঙ্‌ বলে জানি তখন রঙ্‌ দেখা হয় রঙের প্রত্যক্ষ। এখানে ইন্দ্রিয়ে পাওয়া বিষয়কে আমরা রঙ্‌ বলে ব্যাখ্যা করছি। এভাবে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে থাকে ভাবনা, চিন্তা। এইদিক থেকে দেখা যখন প্রত্যক্ষ তখন তা ভেবে দেখা।

আবার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, ভেবে চিন্তে যখন দেখি তখনও তা ভেবে দেখা। বিজ্ঞানী ও দার্শনিক যখন দেখেন তখন ভেবেই দেখেন।

তবে ভেবে দেখার এমন একটা অর্থ আছে যাতে ভেবে দেখা মানে মনন বা চিন্তা করা। সেক্ষেত্রে ভেবে দেখা সাধারণ দেখা নয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা শ্রবণের পর মননের বিধান দিয়েছেন। শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ বা শোনা একপ্রকার প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের পর শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য নিয়ে মনন করতে হবে। অনুরূপভাবে বলা যায়—দেখার পর ভেবে দেখা। এই ক্ষেত্রে দেখা একপ্রকার প্রত্যক্ষ। গীতায় অর্জুন বিষাদযোগে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুতে।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ॥ ১। ২১

"যতক্ষণ যুদ্ধের জন্য অবস্থিত এদের আমি নিরীক্ষণ করি, এই মহা যুদ্ধে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তা নির্ণয় করি এবং দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিত চায় এমন যে সব বীরপুরুষ যুদ্ধ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের পর্যবেক্ষণ করি ততক্ষণ হে কৃষ্ণ, উভয়পক্ষীয় সেনাদনের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন।"

এই ক্ষেত্রে 'নিরীক্ষণ', 'পর্যবেক্ষণ' প্রভৃতি শব্দ দেখা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন যুদ্ধ করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেবার পর যখন বলছেন—এবার তুমি ভেবে দেখ কি করবে, তখন তিনি অর্জুনকে স্পষ্টভাবেই চিন্তা করতে বলছেন।

আমরা ও অনেক সময়ই 'ভেবে দেখ' কথার এমন ব্যবহার করে থাকি। আমরাও বলি—আমার যা বলার বললাম, এবার তুমি ভেবে দেখ কি করবে। এখানে ভেবে দেখা সাধারণ দেখা বা প্রত্যক্ষ নয়, চিন্তা বা মনন।

বহুরূপী ও রবীন্দ্রনাটক

সুকৃতি লহরী

পয়লা মে'-এর সেই উজ্জ্বল সন্ধ্যা—সানাইয়ের সুর আর নাট্যমোদী মানুষের ভিড়ে জমজমাট সুসজ্জিত এ্যাকাডেমী প্রাঙ্গণ—গ্রিলের গেট পার হতেই আন্তরিক ভঙ্গীতে অভ্যর্থনা জানায় একটি চাঁপা ফুল ও প্রদীপের নিষ্কম্প আলো—বৈশাখী বিকেলে, নরম হয়ে আসা আলোয় পুরোপুরি উৎসবের মেজাজ।—প্রায় জন্মলগ্ন থেকে এই নিয়মে পালিত হয়ে আসছে বহুরূপীর জন্মদিন। আটত্রিশ বছর ধরে নিরলস চেষ্টায় বাংলা তথা ভারতের নাট্যপিপাসু দর্শকদের তৃষ্ণা নিবারণ যেমন বহুরূপীর পক্ষে এক গৌরবের ইতিহাস তেমনি বছরের প্রত্যেক দিনের গতানুগতিক জীবনধারা থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের কাছে একটি সহৃদয় উৎসবগন্ধী সন্ধ্যার উপহার দানের কৃতিত্বও তার বড় কম নয়।

স্বভাবতই এক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে এখন তো কলকাতা জুড়ে উৎসবের পর উৎসব লেগেই আছে—এর মধ্যে বহুরূপীর জন্মোৎসব পালনের স্বতন্ত্রতা কোথায়? আমার মনে হয় স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, অন্যান্য উৎসবে আনুষঙ্গিক অনেক কিছু থাকলেও কোথায় যেন একটা অভাব থেকে যায়—এ অভাবটা বোধকরি আত্যন্তিক আন্তরিকতার অভাব, ঐতিহ্যময় ব্যক্তিত্বের অভাব—আত্মীয়তার বন্ধনে পরস্পরকে বেঁধে নেওয়ার অভাব। যে ঘরোয়া পরিবেশ ও আন্তরিক মেজাজ এই দিনটিকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করে তা-যাঁরা উপস্থিত না থেকেছেন তাঁদের পক্ষে চলতি পর্যায়ের ভুঁইফোড় উৎসবগুলির নিরিখে অনুমান করা কষ্টসাধ্য।

এ বছরেই অর্থাৎ ১৯৮৬-তে বহুরূপীর আটত্রিশ বছর পূর্ণ হলো—রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যেই মাত্র নয়—'ধর্ম কি ধর্ম কেন?'—এই উদ্যত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, বর্তমানের ভয়ার্ত জটিল পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বহুরূপী মঞ্চস্থ করল রবীন্দ্রনাথের স্বল্পখ্যাত, প্রায় উপেক্ষিত কাব্যনাটক 'মালিনী'।

রবীন্দ্রনাটককে মঞ্চায়িত ও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার কৃতিত্বের অনেকটাই প্রাপ্য বহুরূপীর। বারবার তাঁরা ফিরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথে—কারণ তাঁরা দেখেছেন রবীন্দ্রনাটকে শুধু সমকালীন প্রতিচ্ছায়াই নেই, আছে সমকাল অতিক্রমী চিরকালের এক সার্বজনীন আবেদন—আছে জীবনকে, মানুষকে নতুন করে খুঁজে নেবার সঠিক নিশানা। বহুরূপী তার আটত্রিশ বছরের জীবনে আমাদের উপহার দিয়েছে সর্বসাকুল্যে ঊনপঞ্চাশটি নাটক (একাংক ও পূর্ণাঙ্গ মিলিয়ে)। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাটকের সংখ্যা দশ। বহুরূপী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাটক-গুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আসবার পূর্বে বহুরূপী সংক্রান্ত কিছু কথা বলে নেওয়া বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'ত্যাগ করো, বৎসে, ত্যাগ করো সুখ-আশা / দুঃখ ভয়, দূর করো বিষয়-পিপাসা; / ছিন্ন করো সংসারবন্ধন;'.....বহুরূপীর বর্তমান নাটক 'মালিনী'তে মন্ত্রগুরু কাশ্যপের এ আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে রাজকন্যা মালিনীর জয়যাত্রা। অন্তরের অপরিসীম করুণা, সততা ও ক্ষমার আদর্শ নিয়ে সাংসারিক মালিন্য মুক্তির অবসানে, মানবলোকে মঙ্গল ও মৈত্রীর উৎসধারাকে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে, তথাকথিত আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের বেড়া ভেঙে মালিনীর পথচলা শুরু। পেশাদারি মঞ্চের প্রচলিত নাট্যধারাকে সবলে আঘাত করে অন্য ধরনের নাটক করার মানসিকতা নিয়েই মালিনীর মত পথে নামে গ্রুপ থিয়েটারের পথিকৃৎ বহুরূপী। তবে মালিনীর মত সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করে নয় বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঁধে নিয়ে 'ভালোভাবে ভালো

নাটক করা'—অবশ্যই যে নাটকে আছে মহত্তর জীবন গঠনের প্রয়াস—এই ছিলো জন্মমুহূর্তে বহুরূপীর মূলমন্ত্র।

'যাত্রা শুরু করেই বহুরূপী দেখতে পেয়েছে তার মাথার ওপরকার আকাশ ঘন কালো হয়ে উঠেছে, অপ্রীতির তুফান তার ছোট্ট তরীখানাকে আঘাতে আঘাতে নিরন্তর কাঁপিয়ে দিচ্ছে, তীরে দাঁড়িয়ে শিবাকুল অমঙ্গল ধ্বনি তুলেছে'—তথাপি থেমে থাকা নয়—'চরৈবেতি' মন্ত্রকে স্মরণ করে আজ পেরিয়ে এসেছে এতখানি পথ। রাজনৈতিক উন্মাদনা ও সামাজিক অস্থিরতার উত্তাল স্রোতের মুখে যে ক্ষুদ্র নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম, সে-ই আজ নাটকের বনে বনস্পতির মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পারিপার্শিক ঝড়-ঝাপ্টা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝে বেঁচে আছে। 'টিঁকে থাকা নয় বেঁচে থাকা'। শুধু বহিরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতই নয় অন্তরঙ্গেও ইতিমধ্যে ঘটে গেছে বড় রকমের রকমফের-অদলবদল। তবু পিছিয়ে পড়া নয়—পূর্ণ কর্মোদ্যমে এগিয়ে চলেছে নিষ্ঠা ও নির্ভীক দৃঢ়তার পায়ে ভর রেখে।

—বহুরূপীর জন্ম ১৯৪৮ হলেও নামকরণ হয় ১৯৫০-এ। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন-অগাস্টবিপ্লব-সাম্যবাদী আদর্শের উদ্দীপনা ইত্যাদি ঘটনায় উত্তাল চল্লিশের দশকের লোকজীবন। এ সময় হঠাৎই মনে হোল বুঝি নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে মোকাবিলা করা যায় পরিস্থিতির—অভিনীত হোল 'নবান্ন'—অভূতপূর্ব সাফল্য তথাপি শুধুই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়ে ইতিহাস হোল 'নবান্ন'। এর আরও কয়েকবছর পর নবনাট্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও 'নবান্ন'-র পুনরাভিনয়ের মধ্য দিয়ে বহুরূপীর কাজ শুরু হোল। শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র লিখেছেন—"১৯৪৮ সালের দেশের ঐ অবস্থায় গুটিকয় লোকের ঐ পাগলামী করার ইচ্ছা না হলে, নাটকের মোড় কোনদিকে যেত কে জানে। যে পাগলামীর অগ্রগণ্য ছিলেন মহর্ষি, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু।"—শ্রীমিত্রের আহ্বানে নট-নাট্যকার মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাপদ বসু ও নাটক পাগল কিছু নতুন ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত হোল বহুরূপী। প্রথমদিকে হঠাৎই গজিয়ে ওঠা এই দলকে কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু একের পর এক চমক সৃষ্টি করল বহুরূপী—'পথিক', ছেঁড়াতার', 'উলুখাগড়া', 'বিভাব'—সচকিত হয়ে উঠল বাংলাদেশের মানুষ—আলোড়ন সৃষ্টি হলো বিদগ্ধ সমাজে। কিন্তু এর পরেই মোড় ঘুরল—মঞ্চে এলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৫১-র ২১শে অগাস্ট শ্রীরঙ্গমে (বর্তমানে বিশ্বরূপা) মঞ্চস্থ হোল রবীন্দ্রনাথের বহু বিতর্কিত উপন্যাস 'চার অধ্যায়'। বহুরূপীর প্রথম রবীন্দ্রনাটকাভিনয়। যদিও এর আগে শ্রীকালী সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 'কাবুলিওয়ালা' হবার কথা হয়েছিলো—কিন্তু ঘটনাচক্রে তা হয়ে ওঠেনি। 'চার অধ্যায়'ই বহুরূপী প্রযোজিত প্রথম রবীন্দ্রনাটক।

এর আগে মঞ্চে এসেছে খনি মজুরের দল (পথিক), গাঁয়ের চাষী (ছেঁড়াতার), উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় (উলুখাগড়া) ও পরীক্ষামূলক নাটক (বিভাব)। এরপরে রবীন্দ্রনাথকে আনা শুধু কি স্বাদ বদলানো বা বৈচিত্র্য অন্বেষার তাগিদ ? নাকি অন্য কোন বিশেষ মানসিকতা কাজ করেছে নাটক নির্বাচনে ?—এ সমস্ত ভাবনার নিরসন ঘটায় বহুরূপীর স্বীকারোক্তি—"আমাদের মনে হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথেই আছে সেই প্রচণ্ড মহৎ জীবনবোধের প্রকাশ, যা একই সঙ্গে লিরিক্যাল, সত্য এবং বাস্তব। 'চার অধ্যায়ে'র ভাষা বলতে বলতেই মনে হয়েছে, কী অসাধারণ এর কাব্যগুণ অথচ কী প্রচণ্ডভাবে সত্য এবং রিয়্যাল। এ রিয়্যালিটির স্তর আলাদা, অসংখ্য মণিমুক্তার মত সত্য এখানে ঝলমল করছে প্রতিটি কথার কাব্যময় ব্যঞ্জনায়। সেই লিরিসিজমকে অক্ষুণ্ণ রেখেই এর রিয়্যালিটির নতুন স্তরে উন্নীত হয়ে কী ক'রে সেই সমগ্র মহৎ জীবনবোধকে প্রকাশ করব, এই ছিলো আমাদের নিরন্তর সাধনা, যা আমাদের পরবর্তী রবীন্দ্রভাবনায়ও সাহায্য করেছে। শুরু হোল সেই দুরূহ সাধনা।"

দীর্ঘদিন আলোচনার পর 'চার অধ্যায়' মঞ্চস্থ করার সংকল্প নেওয়া হলে, এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে বহুরূপীর অভিনয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে বহির্মহলে। অভিযোগ—রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে মানুষকে প্রকাশ

করেননি, প্রকাশ করেছেন তদানীন্তন আন্দোলনের অসাড়তা—তাই এ নাটক অভিনয় করা অন্যায়। কিন্তু বহুরূপী বুঝতে পারেনি এখানে অন্যায়টা কোথায় ? এ নাটকে তাঁরা দেখেছিলেন জীবন, 'মানুষের বাঁচা, তার আত্মসম্মান, তার স্বাধীনতা, তার আকাংখা।' এ নাটকের যে দিকটা তাদের আকর্ষণ করেছিলো তা হোল ভালো-মন্দয় মেশানো দেশের মানুষের চিত্র আর সবচেয়ে বেশী করে যা তাদের নাড়া দিয়েছিলো তা একটি ছেলে ও একটি মেয়ের গভীর ভালোবাসা।—এখানে অভিনয়ের বাধাটা কোথায় ? তথাপি অভিযোগের বিরূপতা তাদের কিছুটা দুর্বল ও শংকিত করেছিলো—তাই তারা ছুটে গেল মহর্ষির কাছে—বহুরূপীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি ছিলেন সে সময়কার রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত—সব শুনে বললেন "করো করো, আমাদের কর্তব্যের খাতিরেই 'চার অধ্যায়' অভিনয় করা উচিৎ ; অন্যায়ের কথা উঠতেই পারে না।"—ব্যাস্ মঞ্চস্থ হোল 'চার অধ্যায়'—পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। 'রক্ত করবী' ছাড়া আর কোন রবীন্দ্রনাটকে এমন ভিড় হয়নি। তবে নাটক সম্পর্কে আপত্তিটা শেষ পর্যন্ত রয়েই যায়—প্রভূত প্রশংসিত হয় প্রয়োগ কৌশল ও অভিনয়। ভাষা আলঙ্কারিক, কথ্যভাষার মত না হলেও সুনিপুণ অভিনয় গুণে ও অনলস প্রচেষ্টায় তাকে কতখানি মর্মস্পর্শী ও হৃদয়স্পর্শী করে তোলা যায় তার-ই জীবন্ত দৃষ্টান্ত শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়—তাঁদের অভিনয় চাতুর্য্যে কাব্যিক রাবীন্দ্রিক ভাষা পর্যন্ত হয়ে উঠেছে সাধারণ কথাবার্তার মতো গতিময়, প্রাণবন্ত। একথা সত্য যে 'পথিক', 'ছেঁড়াতার', 'উলুখাগড়া'-র মত জনপ্রিয়তা 'চার অধ্যায়' পায়নি কিন্তু পরবর্তীকালে 'রক্তকরবী' বহুরূপীকে জনপ্রিয়তার যে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দেয় তারই খানিকটা পথ প্রস্তুত করে দিয়ে গেলো 'চার অধ্যায়'। 'চার অধ্যায়ে'র মধ্য দিয়ে বহুরূপী যে 'দুরূহ সাধনা'য় ব্রতী হয়—বলা যেতে পারে 'রক্তকরবী'তে সে সাধনারই সিদ্ধি।

'রক্তকরবী' বলতেই বহুরূপী—আর বহুরূপী বলতেই 'রক্তকরবী'—একটা নাটক যে একটা দলকে এতখানি সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে তার নজীর 'রক্তকরবী'। আজ পর্যন্ত যত নাটক বহুরূপী কর্তৃক অভিনীত হয়েছে তার মধ্যে 'রক্তকরবী' যে শুধু গুণগত দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ তাই নয়—জনপ্রিয়তা, অভিনয়, কলাকৌশল, পরিকল্পনা,—ব্যবসায়িক সাফল্য, সর্বোপরি বিপুল দর্শকের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান—যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক্ না কেন 'রক্তকরবী' বহুরূপীকে যে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছে আজ পর্যন্ত বহুরূপীর অন্য কোন নাটকের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। নাটক রচিত হবার একত্রিশ বছর পর ১৯৫৪ সালের ১০ই মে 'রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট'-এ বহুরূপী কর্তৃক এ নাটকের প্রথম সফল মঞ্চায়ন। শোনা যায় যে রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের অভিনয় করাতে পারেননি মনোমত নন্দিনী খুঁজে পাননি বলে—সৌভাগ্যক্রমে বহুরূপী পেয়েছিলো সেই নন্দিনীকে—চিরকালের ইতিহাস হয়ে রইল—যা আমাদের প্রজন্মের কাছে শুধুই গৌরবোজ্জ্বল অতীতমাত্র—অন্য মানুষের চোখ দিয়ে দেখে নিই সেই ছবি—শুনে নিই সেই পাগল করা ডাক—শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন "তৃপ্তি মিত্রের 'অনুপ', 'শকুলু' ডাক স্মরণীয় হয়ে থাকে ; ছোটো দুটি হাইফেনে যে স্বরলিপি প্রস্তুত রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার এমন প্রাণভরা উদাত্ত ব্যবহার, এমন বেদনাময় সবল দীর্ঘ খোলা আহ্বান অল্পই শোনা যায় মঞ্চে ! এই কণ্ঠের প্রক্ষেপেই যেন মায়া জন্মিয়ে দেয় যে ঈশানী পাড়ার মতোই মাঠে-প্রান্তরে বিস্তৃত কোনো বাঙলাদেশের স্বাভাবিকতার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।"—এই মায়া বা বিভ্রম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দর্শককে নাটকীয় প্রতিবেশের সঙ্গে একাত্ম করে নাটককে জীবন্ত করে তোলার দায়িত্ব নাট্যকারের ততটা নয়—যতটা দায়িত্ব থাকে নাট্য পরিচালক ও কুশীলবদের। 'রক্তকরবী'র অসামান্য অভিনয় সাফল্যের প্রসঙ্গ স্মরণে রেখে একথা বলা যেতে পারে যে মঞ্চ ও দৃশ্য পরিকল্পনা, পরিবেশ রচনা—সংগীত সৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে শ্রী শম্ভু মিত্র ও শিল্পী খালেদ চৌধুরী যে অভাবনীয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা শুধু সেকালের নয় একালের মানুষের কাছে আজও এক চরম আশ্চর্য্যের বিষয়। 'রক্তকরবী'র পূর্ববর্তী 'দশচক্র'-র মধ্যে দিয়ে বহুরূপী তুলে ধরেছিলো একশ্রেণীর মানুষের চিত্র আর 'রক্তকরবী'র মধ্যে দিয়ে তুলে ধরল সমগ্র রাষ্ট্রিক, সামাজিক, বণিক, শ্রমিক জনতার রূপ—পুরো আধুনিক সভ্যতার চিত্র। কলাকৌশল ও বিষয়বস্তুগত এই দুয়ের অভিনবত্বকে কেন্দ্র করে দর্শক মহলে বিতর্কের ঝড় ওঠে—সংবাদপত্রগুলি মেতে ওঠে

লেখনীযুদ্ধে—নিন্দাও প্রশংসা উভয়ই জুটতে থাকে বহুরূপীর কপালে। এ সময় বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের আপত্তিতে 'রক্তকরবী'র অভিনয় প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়—তথাপি এসব কিছুকে নস্যাৎ করে অভিনয় চলতে থাকে 'রক্তকরবী'র। দিল্লীতে আধুনিক নাট্যাভিনয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে 'রক্তকরবী' নিয়ে আসে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার। এছাড়া ১৯৫৬তে বোম্বাইয়ে বিশ্বনাট্য সম্মেলনে, দিল্লীর ইউনেস্কো সম্মেলনে শতবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রক্তকরবী'র অভিনয় বহির্বিশ্বের মানুষের কাছে ভারতীয় নাট্যগৌরবের স্বাক্ষর রেখে যায়। দিল্লীর স্টেটসম্যান কাগজের সম্পাদক যথার্থ লিখেছিলেন যে নাটকের ভিতর দিয়েও বিশ্বকে দেবার বাণী ভারতের আছে—বহুরূপী অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' দেখে গর্বের সঙ্গে সে কথা বিশ্বের দরবারে বলা চলে।

'রক্তকরবী'র পর 'স্বর্গীয় প্রহসন'—রবীন্দ্রনাথের এই একটি মাত্র প্রহসন বহুরূপী মঞ্চস্থ করে '৫৫ সালের ২২ মে নিউএ্যাম্পায়ারে। মাত্র কুড়ি মিনিটের এ নাটকের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর চেষ্টা হয়, তথাপি স্বল্পদৈর্ঘ্যের এ নাটক বেশীদিন চলেনি, যদিও 'স্বর্গীয় প্রহসনে'র দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, লৌকিক দেবতাদের অভিনব অভিনয় পদ্ধতি দর্শকদের ভালো লেগেছিলো। বহুরূপীর এই প্রহসনটির বিরুদ্ধেও আপত্তি ছিলো বিশ্বভারতীর। তাঁদের অভিযোগ এতে নাকি বহুরূপী পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতাদের মধ্যে ফারাক রেখে শ্রেণী সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে—সম্ভবতঃ কোন এক রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতেই এ নাটকের শেষ অভিনয় হয়।

'রক্তকরবীর' অসামান্য সাফল্যের তিনবছর পর 'ডাকঘর' (৫৭'র ফেব্রুয়ারী)—রবীন্দ্রভাববাহী তৃপ্তি মিত্রের এক করুণ মধুর কবিতা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ও জোঁড়াসাঁকোয় বহুবার এ নাটকের অভিনয় করান। বহু পরিচিত ও বহুখ্যাত 'ডাকঘর' অভিনীত হচ্ছে শুনে দর্শক মহলে আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। দর্শকদের সেই প্রার্থিত আশা পূরণে সক্ষম হয়েছিলো বহুরূপীর শিশু শিল্পীরা। তবে এ ক্ষেত্রেও সেই একই সমস্যা—স্বল্পদৈর্ঘের সমস্যা। তাই বেশীদিন এ নাটকের অভিনয় হয়নি। অবশ্য পরবর্তীকালে (৭৩-এর জুলাই মাসে) পুনরায় 'ডাকঘরের' অভিনয় হতে থাকে।

পরবর্তী রবীন্দ্রনাটক 'মুক্তধারা'য় (৫৮'র ১৫ই ডিসেম্বর)' এসে বহুরূপীর খ্যাতি ও ঔজ্জ্বল্য কিছুটা ম্লান ও স্তিমিত হয়ে পড়ল। এঁরা চেয়েছিলেন 'মুক্তধারা'কে নতুনরূপে নতুনভাবে মঞ্চায়িত করতে। কিন্তু তার জন্য যা প্রয়োজন ছিলো অর্থাৎ অনেক লোক—বড় মঞ্চ—ছোট ছোট পার্টের জন্য ভালো অভিনেতা—এর অনেক কিছুই তাঁরা পাননি। এছাড়া রক্তকরবীর, পর বহুরূপীর কাছ থেকে দর্শকদের প্রার্থিত আশার পরিমাণটাও অনেক বেড়ে গিয়েছিলো—যা মেটাতে পারলো না 'মুক্তধারা'—মাত্র সাতটি অভিনয়ের পর 'মুক্তধারা' বন্ধ হয়ে যায়। 'রক্তকরবী', 'পুতুলখেলা' (ইবসেন)-র সাফল্যের পর 'মুক্তধারা'র অবনমন আমাদের পীড়া দেয়, মনে হয় বহুরূপী যেন থমকে গেল, থেমে গেলো। তবে ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটা কথা আছে, "প্রত্যেক থামার অর্থই হচ্ছে দশগুণ জোরে চলবার শক্তি অর্জন করা"—আর এ কথারই সত্যতা প্রমাণ করল বহুরূপী, 'বিসর্জনে'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'মুক্তধারা'র তিন বছর পর রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে (৬১'র ১১ই নভেম্বর) দিল্লীর আইফ্যাক্স্ হলে 'বিসর্জনের' প্রথম অভিনয়। বিষয়বস্তু নাটকের মূল অবলম্বনে একথা অনস্বীকার্য কিন্তু অনেক সময় পরিচালকের ব্যক্তিত্বময় নির্দেশনা ও অভিনেতাদের গুণে কোন পরিস্থিতি বা চরিত্র এমন কিছু অর্থময় আবেদন সৃষ্টি করেন যা আমাদের সমাজবোধকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে দিয়ে যায়। বহুরূপীর কাছ থেকে এ উপরি-পাওনাটুকু পাওয়ার অভিজ্ঞতা দর্শকদের আছে। নাটক নির্বাচন ও উপস্থাপনারীতির স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী, নাটককে সমকালীন পরিস্থিতি বা সময়ের উপযোগী করে তোলার যে প্রবণতা আমরা বহুরূপীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি 'বিসর্জন'-ও তার ব্যতিক্রম নয়—এ নাটকের বহুরূপীকৃত শিরোনামটি লক্ষ্য করলে তা বোঝা যাবে।

শিরোনামটি ছিলো এরূপ—'আজকের নাটক/রবীন্দ্রনাথের/বিসর্জন'—বর্তমানের জটিল উন্মাদনাময় পরিস্থিতি থেকে সরে এসে নয়—এরই মধ্যে সংগ্রাম করে বাঁচবার একটা নিশানা তাঁরা খুঁজে নিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে—"মানুষের সমস্ত স্বর্গীয় অনুভব,আর কল্পনা দেবতার মূর্তি সৃষ্টি করে/তাতে মানুষেরই আত্মা মুক্তি পায়।/ কিন্তু ক্রমশঃ একদিন দেখা যায় মন্দিরের সমস্ত আসন / অধিকার করে বসে আছে পূজারী প্রচারকের দল।/ তাদের অহঙ্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞতায় দেবীরই / বেদীর সামনে নির্বিচারে / মানুষের সমস্ত মূল্যবোধকে বলি দেওয়া হয়।/ আজও / পৃথিবীতে অজস্র রাজনৈতিক বেদীর / সামনে আদর্শের নামে, ভবিষ্যতের / নামে, ঐতিহ্যের নামে—ব্যক্তিগত মানুষের / সুখ-দুঃখ তার আশা, তার ভালবাসা / সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞায় ভূ-লুণ্ঠিত করে / এক বিরাট নরমেধ যজ্ঞের / আয়োজন ইচ্ছা।/ সমাসন্ন সেই ভয়ঙ্কর বিসর্জনের / সামনে দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো / বিসর্জন নাটকে বাঁচবার পথের / একটা দিশা পাব।"

'বিসর্জনে' বহুরূপী খুঁজেছে বাঁচবার পথের একটা দিশা আর এই বেঁচে থাকবার একটা মূল অবলম্বন হলো প্রেম। সেই প্রেমের স্তব্ধতা ও তার স্বরূপসত্য অন্বেষণে তাঁরা এলেন অন্ধকারের নাটক 'রাজা'য়। ঘোষণায় অন্ধকারের নাটক বলা হলেও মনে হয় 'রাজা' অন্ধকারের নাটক নয়—অন্ধকার অতিক্রমণের নাটক। রাণী সুদর্শনা ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাজার বহির্রূপকে—সৌন্দর্য্যকে। কিন্তু রাণীর প্রভু তো কোন বিশেষ স্থানে বা রূপে নেই, আছে সকল কালে সকল দেশে—একমাত্র আন্তর রসে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। সত্তার গভীর অন্বেষণকে, অন্তরের মিলনকে উপেক্ষা করে মোহাবিষ্ট পতঙ্গের মত সুদর্শনা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো বাইরের বাহারী আলোয়। বিভ্রান্ত সুদর্শনাকে রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে আনলেন অবশেষে—। দুঃখাগ্নিতে হোল তার চিত্ত শুদ্ধি—উত্তরণ ঘটল বিশুদ্ধ প্রেমের আলোকে। 'রাজা'—রাণী সুদর্শনার এই উত্তরণ ও আত্মপোলব্ধির তীর্থযাত্রারই কাহিনী। 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর সেই প্রাণোচ্ছল সরলতা নয়, 'রাজা'র প্রথম দৃশ্যে নিকষ কালো মঞ্চের অন্ধকারকে খান্‌খান্‌ করে "আলো আলো কই"—তৃপ্তি মিত্রের এই একটি মাত্র সংলাপোচ্চারণে ফুটে উঠত আলোক-বুভুক্ষু এক নারীর চরম আর্তি—সচকিত হয়ে উঠত দর্শক। যাত্রান্তে ঘরে ফেরার পথে ভোরের অস্পষ্ট আলোয় দুঃখ পথযাত্রিনী সুদর্শনার অবিস্মরণীয় সেই 'ঠাকুর্দা' ডাক। "অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের কৌশলে মনে হয় যেন যুগযুগান্তের প্রতীক্ষার অবসান হোল, 'পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ'। "—অভিনয় এতখানিই প্রভাবিত করতে পারে মানুষকে ! শম্ভু ঘোষের একটি চমৎকার মন্তব্য '…রাজা বা রক্তকরবীর দশটি ক্লাসের চেয়ে এক রাত্রি বহুরূপীর অভিনয় লক্ষ্য করা এমনকি ছাত্রগণের পক্ষেও উপকারী। কেননা এর দ্বারা আপাত অনড় রেখাসমষ্টির সচল বিন্যাস বোঝা যায়, কণ্ঠস্বরের বিচিত্র উত্থান পতনে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিশেষ রূপে মনের মধ্যে চিহ্নিত হতে পারে।"

রাজা ও পরবর্তী রবীন্দ্রনাটকের মধ্যে একটা বিরাট সময়ের ব্যবধান—প্রায় ন' বছর পর 'ডাকঘর' পুনরাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সেই ছিন্নসূত্র যুক্ত হোল। 'ডাকঘরে'র পর রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'দুরাশা' নিয়ে একটি একাংক ও উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'র নাট্যরূপ দিয়ে পরপর দুবছরে দুটি রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ করল বহুরূপী। এরকম ধারণা অনেকেই পোষণ করেন যে বহুরূপী মানে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র—কিন্তু 'ঘরে-বাইরে'-তে এঁদের দুজনার কেউ-ই অভিনয় করেননি—বহুরূপীর জুনিয়র গ্রুপের অভিনয়-এ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটায়। তবে 'মুক্তধারা' ও স্বর্গীয় প্রহসন-এর কথা বাদ রেখে বলা যায় যে শ্রীশম্ভু মিত্রের অতিমানুষীয় উদ্ভাবনী শক্তির যাদুস্পর্শে রবীন্দ্রনাটকে বহুরূপী যে চরমোৎকর্ষতা উন্মোচিত করে, 'দুরাশা' ও 'ঘরে-বাইরে'র ক্ষেত্রে সে উৎকর্ষতার যে কিছুটা ঘাটতি রয়ে যায় একথা অস্বীকার করা যায়না।

বহুদিন পর্যন্ত এমনকি এখনো পর্যন্ত এরকম একটা ধারণা প্রবল যে রবীন্দ্রনাটক কেবলমাত্র পাঠের জন্য, অভিনয় যোগ্য নয়—কিন্তু মূলের এতটুকু বিকৃতি না ঘটিয়ে অভিনয় কৌশল, সৃষ্টিশীল মানসিকতা, সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ভাবনা চিন্তা, অভিনব প্রয়োগকৌশল ও সর্বোপরি রবীন্দ্রভাবসমৃদ্ধি ও

শ্রদ্ধার দ্বারা রবীন্দ্র নাটককে মঞ্চে যে কতখানি জীবন্ত করে তোলা যায়, তাকে 'মঞ্চচল' করা যায়—প্রত্যেকবারের মতই তা আবার প্রমাণ করল বহুরূপী। পেশাদারি মঞ্চের প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ! তাও আবার কাব্য নাটক।—কবির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এ বহুরূপীর দায়মোচন নয়, তাঁদের মনে হয়েছে 'রবীন্দ্র নাটকের ব্যাপারে আমাদের একটা অনভ্যাস তৈরী হয়ে গেছে। সেই অনভ্যাসকে···পাল্টাতে হলে প্রয়োজন হল, শ্রদ্ধা, অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি, অনুশীলন ও সজীব কল্পনা।'—আমরা আশা করব একশ পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পর পুনরপি রবীন্দ্রানুশীলনের নতুন পাঠ শুরু হবে। এবং নানা দিক থেকে আঘাতে অনুরাগে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে পারব।" সমকালীনতার কোন বেড়াজালে আবদ্ধ নন বলেই সময়ের সঙ্গে যুগের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করা বারে বারে বহুরূপী অধিকার করেছে রবীন্দ্রনাথকে তাদের অন্তর্দৃষ্টি, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার মধ্যদিয়ে—প্রকাশ করেছে সজীব কল্পনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় হানাহানির অস্থিরতার পটভূমিতে তাই 'মালিনী' নাটক নির্বাচন ও মঞ্চায়ণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। বর্তমান পরিচালক কুমার রায়ের বক্তব্যেও তারই আভাস মেলে—"আমাদের সংকট মুক্তির, আমাদের গভীর গভীরতর অসুখের খবর এবং সেই সঙ্গে রোগ মুক্তির নিদান আর কে দিয়েছেন বাংলা ভাষায়? এ শুধু মুক্তধারা, রক্তকরবী বা রথের রশির প্রসঙ্গেই সত্য—তা নয়। সাম্প্রতিকতা ও প্রতিমুহূর্তের প্রত্যক্ষতা এ নাটকগুলি ছাড়া ছড়িয়ে আছে অনেক নাটকে, এমনকি তাঁর প্রথম দিকের লেখা বিসর্জন ও মালিনীতেও।"—তবে বইয়ে পড়া মালিনী আর বহুরূপী প্রযোজিত মালিনী—উভয়ের মধ্যে ফারাক যথেষ্ট। একাধিক ভিন্নাংশের যোজনা করেছেন পরিচালক, অন্য নাটকের গান এনেছেন এ নাটকে, রবীন্দ্রনাথের দৃশ্যসজ্জার ক্রমপারম্পর্যও রক্ষিত হয়নি সর্বত্র—তথাপি একথা কখনোই বলা যায়না যে বহুরূপী রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেছে বা বিকৃত করেছে। আসলে 'মালিনী'তে যে অভাবটা ছিলো, সেই অভাব পূরণ করে নাটককে আরো বেগবান, গতিময় ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য পরিচালকের এই স্বাধীনতা গ্রহণ নিন্দনীয় বলে আমি মনে করিনা। নাটকের প্রয়োজনে, নাটকের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে রবীন্দ্রসৃষ্ট ভূমি থেকেই সম-মানসিকতার ফসল তুলে নিয়ে 'মালিনী'র পরিপূর্ণতা দান। এই দুঃসাহসিক পথে পা বাড়ানোর সাহস বহুরূপীর আছে। যা তারা দিনে দিনে সঞ্চয় করেছে—। দীর্ঘ দিনের রবীন্দ্র সাধনার সেই মহৎ ঐতিহ্য নিয়ে বহুরূপী প্রমাণ করল যে এখনো রবীন্দ্র নাট্যচর্চার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি—কুমার রায়ের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি যে "রবীন্দ্রনাথের নাটকও নাটকের শেষ কথা নয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা নাটক, ভারতীয় নাটকের একটা বড় ঐতিহ্য তৈরী করতে এখন রবীন্দ্রনাট্যচর্চারই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।" —এ শুধু তাঁদের মুখের কথাই নয়—দীর্ঘ দিন ধরে তাঁরা এ চর্চায়ই ব্রতী থেকেছেন আর বহুরূপীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এখানেই যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সবার মধ্যে এনেছেন—রবীন্দ্রনাটকের দর্শক তৈরী করেছেন—রবীন্দ্রনাটকের অভিনেতা তৈরী করেছেন।

"কৃষ্ণচরিত্র"-এর দার্শনিক প্রত্যয়ের উদ্ভাবনভূমি

অসিত সেন

সাহিত্য সাধনার ভূমিকালগ্নে বঙ্কিমের প্রাশ্নিক মানসের অভিব্যক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—"অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হইত—'এ জীবন লইয়া কি করিব ? কি করিতে হয় ? সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি।" শুধুমাত্র জীবনের অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে নয়, দেশী ও বিদেশী গ্রন্থরাশির পাতায় পাতায়ও চলেছিল এই পূর্ণাঙ্গিক ও আদর্শিক জীবনস্বরূপের সান্দ্র সংবীক্ষণ—"সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়াছি।" সেই কারণে আদর্শানুগ ও পূর্ণাঙ্গিক জীবনের রূপকল্প নির্মাণের প্রয়োজনীয় প্রকরণরূপে বিভিন্ন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনতত্ত্বকে স্বীকৃতি জানাতে বঙ্কিম সংকোচবোধ করেন নি। আমাদের উদ্দেশ্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমের দার্শনিক প্রত্যয়ের উদ্ভাবনভূমিরূপে প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শনতত্ত্বের সন্ধান।

"দেবীচৌধুরাণী", "রাজসিংহ" এবং "সীতারাম" উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্বের অপরিণত পূর্বাঙ্কুরের অস্তিত্ব অস্বীকার না করেও বলা যায় বঙ্কিম তাঁর শিল্পিত চোদ্দটি উপন্যাসে সামগ্রিক ও সার্বভৌমিক জীবনাদর্শের সন্ধান পাননি। জীবন-জিজ্ঞাসার অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় তাঁকে এক সময়ে নীত হতে হয়েছে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ জগতে। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমের তীব্র অন্বেষার প্রথম পরিতৃপ্তি। "কৃষ্ণচরিত্র" রচনার প্রকল্পনায় বঙ্কিমকে নিঃসন্দেহে প্রাণিত করেছে রবার্ট সীলির বেনামীতে প্রকাশিত "Ecce Homo" (১৮৬৬ খ্রীঃ)। এই গ্রন্থ যীশুখ্রীষ্টের জীবনালেখ্যের এক আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণ। "কৃষ্ণচরিত্র"-এর কৃষ্ণও আদর্শ মানুষের প্রতিকৃতি মাত্র। সীলি তাঁর অন্যতম গ্রন্থ "Natural Religion"-এ (১৮৮২ খ্রীঃ) সংস্কৃতির তত্ত্বভিত্তিতে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, অথবা চেয়েছেন সংস্কৃতি ও ধর্মের এক অচ্ছেদ্য আত্তীকরণ। বঙ্কিমের কাছেও একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বোধের আলোকে ধর্মীয় সংকটের মীমাংসা প্রত্যাশিত ছিল। যদিও একথা সত্য যে, সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে সীলি ও বঙ্কিমের দৃষ্টিকোণের ব্যবধান দুস্তর। প্রসঙ্গতঃ গ্যেটের নির্দেশিত সংস্কৃতির সংজ্ঞা উল্লেখ্য—"Life in the whole, in the good, in the beautiful." সীলির সংস্কৃতি-চেতনা গ্যেটের অনুবর্তী। পক্ষান্তরে, বঙ্কিমের কাছে সংস্কৃতির তাৎপর্য অনুশীলিত বৃত্তি-চতুষ্টয়ের সমঞ্জসীভূত স্ফূর্তি ও উদ্‌বর্তন। কিন্তু এই আপাতিক বৈষম্য সত্ত্বেও পরিণতিতে উভয়েই সৌন্দর্যপ্রসূত নীতিবোধের অভিসারী।

"কৃষ্ণচরিত্র" রচনার প্রারম্ভিক পর্বে বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন তত্ত্বের বিশেষীকরণ অপরিহার্য্য, নতুবা সেই তত্ত্ব অনুসরণীয় হিসাবে গৃহীত হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের একটি উদ্ধৃতির ভগ্নাংশ পুনরুৎকলন করছি—"অনুশীলন-ধর্মে যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট।" বঙ্কিমের এই উপলব্ধির নেপথ্য প্রতিবেদনরূপে সক্রিয় ছিল দার্শনিক হেগেলের কিছু চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্তব্য। হেগেল তাঁর "শুদ্ধ প্রত্যয় বিজ্ঞানে" (The Science of Pure Concepts or Logic) সত্তার (Being) অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন অনন্তের সার্থক আত্মপ্রকাশ সান্ত এবং অনন্তের এই পরিণতিকামী সীমায়িত মূর্তনই বিশেষ (Individual)। সুতরাং এখানেই বোঝা যায় কৃষ্ণচরিত্রে অনুশীলনধর্মের ব্যক্তিভবনের তাৎপর্য কতখানি হেগেল অনুসৃত। কৃষ্ণচরিত্রের "ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ?" নামাঙ্কিত শীর্ষকে নির্গুণ ঈশ্বরের বুদ্ধি-

গ্রাহ্যতার অসম্ভব্যতা আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বাস্তবমুখী মন্তব্য—"কেন না মনুষ্যের এমন কোনো বুদ্ধিবৃত্তি নাই, যদ্দারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বরকে বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেন না আমাদের সে শক্তি নাই।" বঙ্কিম এই নিজস্ব বিশ্লেষণের স্বপক্ষীয় যুক্তি হিসাবে "সগুণেরও অপেক্ষা সগুণ ঈশ্বরে" হার্বার্ট স্পেনসারের উল্লেখ করেন। কিন্তু বঙ্কিমের এই বাস্তবধর্মী মতামতের সঙ্গে ভাববাদী হেগেলের একটি অর্থবহ মন্তব্যের নিবিড় সারূপ্য বিশেষভাবে নির্দেশযোগ্য। হেগেল তাঁর "শুদ্ধ প্রত্যয় বিজ্ঞানে" সত্তার ক্রমবিকাশ আলোচনার অনুষঙ্গে সিদ্ধান্ত করেছেন যে সার্বভৌমিক ও সর্বব্যাপী সত্তার বুদ্ধিগ্রাহ্য অস্তিত্ব বিশেষীকৃত বস্তু, নির্বিশেষ সত্তা আমাদের জ্ঞানের অগম্য ফলতঃ আমাদের কাছে অস্তিত্বহীন। সুতরাং শুদ্ধ সত্তার কোনো বস্তুভূত স্বীকৃতি নেই।

কোঁতের দৃষ্টবাদে (Positivism) গঠনধর্মী কর্মসাধনা, মানবতাবাদের প্রবর্তনা এবং ঐহিক যুক্তিবোধের প্রস্তাবনা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশকে এক অভিনব জীবন প্রতিন্যাসে দীক্ষিত করে। বঙ্কিমের দার্শনিক প্রত্যয়ভূমির নির্মাণকার্যে জীবন সম্পর্কিত এই বোধোদয়ের গহন-সঞ্চারী প্রতিক্রিয়া প্রণিধানযোগ্য। কোঁৎ (Comte) ধর্মের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন, কিন্তু ধর্মবোধের কেন্দ্রে অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক অস্তিত্ব পরিহার করেছেন। তাঁর এই মানবতাবাদের অনায়াস প্রবর্তনার অনিবার্য ফলশ্রুতি মানবদেবীর পূজা (The Culturs of Humanity)—কোঁতের ভাষায় "Grand Etre" (মহাসত্তা)। মানুষের এই উপাস্যমূর্তির সহনীয়তাকে বঙ্কিম স্বাগত জানিয়েছেন, অন্ততঃ কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণের মানবিক মূল্যবোধের প্রতি বঙ্কিমের আন্তরিক প্রশস্তি এই সত্যের সাক্ষ্যবহ। "কৃষ্ণচরিত্র"-এর সম্পূরকধর্মী "ধর্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বঙ্কিম উৎকলিত কোঁতের উদ্ধৃতিতে অনুশীলন তত্ত্বের পশ্চাদ্‌পট সামান্য আভাসিত—"Religion in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive make of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical are made habitually to converge towards one common purpose." বলাবাহুল্য, এই সাধারণ উদ্দেশ্যই "The rally point for all the separate individual." বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বে এই "সাধারণ উদ্দেশ্য" বা "সম্মেলনবিন্দু" রূপভেদে সামান্য বিবর্তিত হয়ে বৃত্তি চতুষ্টয়ের চূড়ান্ত পরিণাম "ভক্তি" ("যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি") হিসাবে উপস্থাপিত। কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণের আত্মভক্তি বা আত্মরতি ভক্তিচর্চার প্রান্তিক আত্মঘোষণা। কোঁতের অভিমতের সঙ্গে এই সারূপ্য সত্ত্বেও কোঁতের ঈশ্বরতায় অনাস্থা এবং প্রামান্য হিসাবে আপ্তবাক্যে অস্বীকৃতিকে বঙ্কিম অনুমোদন করেন নি। সুতরাং ক্ষেত্র বিশেষে কোঁতের অনুবর্তন সত্ত্বেও বঙ্কিম দৃষ্টবাদী নন। কোঁতের দৃষ্টবাদের প্রায় সহগামী প্রপাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মানস মণ্ডলে বেন্থামের হিতবাদ (Utilitarianism or Benthamism) প্রতিকর্ষক হয়ে উঠেছিল অন্তর্গত সার্বজনিক আবেদনের জন্য। পরবর্তী কালপর্বে বেন্থামের উত্তরসূরী মিলের চিন্তান্যাস এই মতবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিপ্রস্তরকে আরো দৃঢ়িষ্ঠ ও প্রসাধিত করেছিল। হিতবাদের কেন্দ্রীয় অভিধেয় সংখ্যাগরিষ্ঠের সর্বাধিক সুখ (Greatest Good of greatest number)। এখানে হিত (Good) শব্দটির বিশিষ্ট অর্থ সুখ (Pleasure)। সেই কারণে অধ্যাপক সিজ্‌বিক হিতবাদকে "সমষ্টিগত সুখবাদ" (Universalistic Hedonism) অভিধায় আখ্যায়িত করেন। হিতবাদে সুখদুঃখের নিরিখে ধর্মাধর্ম নিয়ন্ত্রিত। এই প্রসঙ্গে মিলের উদ্ধৃতি স্মরণ করা যেতে পারে—"The first principle of utilitarianism is 'that actions are right and wrong inproportion as they tend to promote happiness'." বঙ্কিম হিতবাদের দার্শনিক দিগ্‌বলয়ে আপ্রিত, এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের নিঃসংকোচ ঋণ স্বীকার "কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থারম্ভে বুঝাইয়াছি যে ধর্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না—"। এমনকি, মহাভারতের অন্তবর্ত্তী জরাসন্ধ বধের কাহিনীটিকে কৃষ্ণের সৌরাজ্য স্থাপনের প্রস্তাবনা হিসাবে স্বীকৃতি বঙ্কিমমানসে হিতবাদের প্রতিক্রিয়া মাত্র। বঙ্কিমের সংলাপে অনুশীলনতত্ত্বের উৎসারণভূমিতে

হিতবাদের তাৎপর্য—"অনুশীলনে হিতবাদের স্থান কোথায়? প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যে।" প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে বঙ্কিমের ধর্মপ্রত্যয়ের একমাত্র আধার হিতবাদ নয়—একটি কৌণিক সত্তা মাত্র। এইখানেই হিতবাদীর আত্মপ্রসাদ ও বঙ্কিমের স্বকীয় প্রজ্ঞার মূলগত বৈসাদৃশ্য।

কৃষ্ণচরিত্রের দার্শনিক প্রেক্ষাপটে এক প্রগাঢ় মাহাত্ম্য যোজনার প্রয়োজনে বিভিন্ন দার্শনিক প্রতীতিকে প্রত্যক্ষভাবে বা সামান্য বিবর্তিত ছদ্মবেশে নির্বাধে গ্রহণ করেছেন যেমন বঙ্কিম, ঠিক তেমনি কৃষ্ণচরিত্রের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রত্যবেক্ষণে অনুস্যূত হয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তন-প্রণালী। বহুখণ্ডে প্রকাশিত "The Principles of Sociology" নামক গ্রন্থে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার আদিম ও অর্বাচীন মানুষের নির্বেদ-প্রসূত আতঙ্ক ও কুসংস্কারের বিজ্ঞানসিদ্ধ সমীক্ষা করেছিলেন। মেধাস্পৃহ বঙ্কিমের কাছে নিশ্চয় এ গ্রন্থ অনধীত ছিল না।

কৃষ্ণ চরিত্রে কৃষ্ণ সম্পর্কিত অপ্রাকৃত অথবা রূপকধর্মী কাহিনীর (পুতনাবধ, শকট বিপর্যয়, তৃণাবর্ত্ত বৎসাসুর-অঘাসুর-বধ, কৃষ্ণকেশী বধ) রহস্য উন্মোচনে হার্বার্টের আবিষ্কার পদ্ধতির নিষ্ণাত প্রয়োগ বঙ্কিমের সংশ্লেষ শক্তির স্বাক্ষর। কৃষ্ণ চরিত্রকে আমাদের বহুলালিত কিংবদন্তী এবং উত্তরকালীন প্রক্ষেপণের-অনৃতচারিতা থেকে মুক্ত করে একটি প্রাত্যয়িক ও নির্বুঢ় ভূমিতে স্থাপনের উদ্দেশ্যে বঙ্কিম ব্যবহৃত যুক্তি-সরণীর অন্যতম—"এখন যদি দেখা যায় যে কোন একটা গুরুতর বিষয় ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত।" আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বঙ্কিম এই "নির্বাচন-প্রণালী" প্রচয়নের ক্ষেত্রে মিলের অন্বয়ী পদ্ধতির (The Method of Agreement) স্মরণ নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে মিলের তর্কবিদ্যা বঙ্কিমের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বিষয় ছিল।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সন্নিকর্ষে বঙ্কিমের জীবনাদর্শের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল একটি বিশিষ্ট বিজাতীয় বোধ, বঙ্কিমের অনুবর্তনে বলা যায়—"স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।" এই "স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা" এবং "জাতিপ্রতিষ্ঠা"র নিকটতম প্রতিশব্দ নিশ্চয় জাতীয়তাবোধ। ভৌগোলিক প্রতিবেশ যে জাতীয়তাবোধের তাৎপর্যপূর্ণ উৎস এবং জাতির অন্তঃপ্রকৃতি যে ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকের অনুগত—এই সত্য তিনি মণ্টেস্কু ও বাক্‌ল্ প্রমুখ বিভাষী বিদগ্ধদের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কৃষ্ণ চরিত্রে এই মনস্বিতার কম্বুকণ্ঠ একটু অস্ফুটে উচ্চারিত হয়েছে। কেবলমাত্র কৃষ্ণকে "Hindu Ideal" অথবা the "wisest and greatest of Hindus" হিসাবে প্রতিপাদনের মধ্যবর্তিতায় বিস্মৃত অতীতের উদ্ভাসনে নয়, কৃষ্ণচরিত্রের স্বাজাত্যপ্রীতির কারণীভূত সত্তারূপে গোকুলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও আহিরী জীবিকার বিশিষ্ট ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিতময় নির্দেশেও বঙ্কিমের এই আহৃত বীক্ষার আলোকপাত লক্ষণীয়।

জীবনচর্যার যে পূর্ণতার সঙ্গম বঙ্কিমের অন্বিষ্ট ছিল, তার সাংকেতিক বিকিরণ বিভিন্ন প্রতীচ্য দার্শনিক প্রজ্ঞায় থাকলেও অখণ্ড সামগ্রিকতা ছিল না। সেই কারণে প্রাচ্যের প্রাচীন মণীষার দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি এবং গীতার অধ্যাত্মতত্ত্ব তাঁর কাছে আদর্শায়িত জীবনের মুকুর বলে বোধ হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই অনুভবের প্রেরণায় তিনি প্রনুন্ন গীতার নবতর ব্যাখ্যায়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মন্তব্য—"কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্বলোকহিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম্ম আর কখনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।" বলাবাহুল্য গীতা যে কৃষ্ণোক্ত এই বিশ্বাস বঙ্কিম পোষণ করতেন—"কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্মমতের সংকলন, ইহা আমার বিশ্বাস।" কৃষ্ণের জীবনাচরণে শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সুসংহত সমাহার এবং সুষম স্ফূর্তির শব্দলেখ "কৃষ্ণচরিত্র।" গীতার ত্রি-ধারাকে (প্রদানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ) অবলম্বন করে বঙ্কিমের এই অনুশীলন তত্ত্বের বহু শাখায়িত উদ্ভেদ্। প্রাগুক্ত চারিটি বৃত্তি এই ত্রি-মার্গের অনুক্রমিক রূপান্তর। গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-গহনতাকে স্বীকরণ সম্পর্কে বঙ্কিমের স্বীকারোক্তি

মুহূর্তে আলোকিত করে অনুশীলনতত্ত্বের পাদপীঠ—"ভগবদ্‌গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত, এই ধর্ম অনুশীলনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।"

বঙ্কিমের জীবনালেখ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে একটু গবেষণাধর্মী অভিনিবেশ করলে দেখা যাবে বঙ্কিম তাঁর প্রাতিস্বিক চিন্তান্যাসকে বারবার পরিবর্তিত করে অপেক্ষাকৃত সত্যতর দিগদর্শনায় আত্মস্থ হতে চেয়েছেন। বঙ্কিমের সমকালিক কালীনাথ দত্ত লিখেছেন—"বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবে আমাদের বড় কষ্ট হইত।" এই উদ্ধৃতি থেকে সহজেই নিষ্পাদিত হয় যে পারত্রিকবোধকে বঙ্কিম প্রশ্রয় দেননি, কারণ প্রত্যক্ষ নির্ভর যুক্তিবোধে তাঁর আস্থা ছিল সুদৃঢ়; এবং সেই কারণেই "সাম্যে" অবিমিশ্রভাবে আলোচিত হয়েছে বৈশ্যিক সমতার জিজ্ঞাসা, কোনো আধ্যাত্মিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নয়। অথচ উত্তরকালে এই অধ্যাত্মচারিতার অসদ্ভাবের জন্য বঙ্কিম "সাম্য"-এর প্রতি উদাসীন, আরো স্পষ্ট ভাষণে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রতীপ বিন্দুতে অপসর্পণ বঙ্কিমের চিন্তাধারার একটি তাৎপর্যবাহী দিগন্ত-উন্মোচন। বস্তুতঃপক্ষে, বঙ্কিম অনুভব করেছিলেন একান্ত বস্তুমুখী চৈতন্য কখনও চূড়ান্ত আদর্শের সন্ধান দেয় না। এই অন্তঃসংজ্ঞা তাঁর যুগমুক্তির প্রবণতাকেও একটি আধ্যাত্ম-বলয়ের দিকে অক্লেশে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেই কারণে প্রবল ঐহিকতাসম্পৃক্ত পশ্চিমদেশীয় দর্শনধারার আংশিক সমর্থন ও আত্তীকরণ সত্ত্বেও নিরীশ্বরবাদী মননশীলতাকে বঙ্কিম কখনও পূর্ণ স্বীকৃতি দেননি। বঙ্কিমের এই ঈশ্বরমুখী জীবনবীক্ষা ঐতিহ্য-সচেতনতার-সহাবস্থানে উৎকীর্ণ হয়েছে "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে। কারণ কৃষ্ণের মানবতা প্রতিপাদনের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও উপান্তিক পর্যায়ে কৃষ্ণের আত্মরতি এক অলৌকিক কুহককে ঘনীভূত করে, ফলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংবীত থাকে না।

মোহনায় এক মানুষ

অচ্যুত মণ্ডল

এই শহরটা কেমন একাচোরা। রাস্তার দুপাশে, বাস থেকেই দেখা যাচ্ছিল খোড়োচালের পাইস হোটেল, দোমড়ানো টিনের দোকান ঘর, চটা ওঠা পলেস্তারা লাগানো রদ্দিকালের পাকাবাড়ী। তারই মাঝে নেহাতই বেখাপ্পা গোটাকয় হালফ্যাশনের দেশলাই খোপমার্কা ফ্ল্যাট। একেবারে টো টো মফস্বল শহর।

টালমাটাল বাসের সঙ্গে সঙ্গেই বাঁকাচোরা রাস্তাটা কে যেন টেনে সোজা করে দিল একেবারে নাকবরাবর। যতদূর দেখা যায় শুধু জল। নদী এখানে খুব চওড়া। মোহনার কাছে তো! শহর থেকে চলনসই দূরে নদীর কোল ঘেঁষে বাসস্ট্যাণ্ড। মোহনার দিকে বিস্তর বাস ছাড়ে।

মাটিতে পা রেখেই মফস্বল শহরের আঁচ পাওয়া গেল চাদ্দিকে। কয়েকটা ছড়ানো ছিটোনো খোড়ো চালের পাইস হোটেল, চা-দোকান! তারই একটাতে ফাটা বেন্চ আর নোংরা বয়ামের 'শো কেসে' লেড়ো বিস্কুট আর বাসী কোয়ার্টার পাঁউরুটির সম্ভার সাজিয়ে দড়কচ্চা মারা এক বুড়ো বসে ঝিমোচ্ছে। খদ্দের বলতে শুধু দুটো নেড়ি।

এক পুরনো বটতলায় আদর্শ হিন্দু হোটেল। ভাঙাচোরা বেন্চে কলাই করা ফ্যাকাসে থালা তোবড়ানো গেলাস আর বাসী ডাল তরকারীতে ভনভনে মাছি ছাড়াও এদের 'বৈশিষ্ট্য' হল 'পরিচ্ছন্নতা।'

গোটাকয় সাইকেল রিক্সাও ছড়ানো আছে এদিক সেদিক। একজন এগিয়ে আসে। অলস ভঙ্গীতে ফিরিওলীর মত টেনে টেনে বলে যায়, "আসুন বাবু লাইট হাউস, কেল্লা, জেটি……।"

প্রত্যাখানেও রিক্সাওলার মুখে কোনও ভাঁজ পড়ে না। পায়ের পেশীতে সামান্য ওঠানামায় রিক্সা এগিয়ে যায়। এই শহরে সবই কেমন ধীরেসুস্থে। কোথাও কোনো তাড়াহুড়ো নেই। মোহনার কাছে বলে নদীও খুব ধীর। যেন চলতেই চায় না।

কালো পীচের টানা রাস্তা ধরে সোজা হাঁটলে বড্ড হাওয়া। বাঁদিকে নদীর ঢাল। খানকয় মাছধরা নৌকো বাঁধা আছে। দূরতক, নদীর পাড় থেকেই ঢিবি উঠেছে সারি সারি। একটা থাম।

ওসব নিয়েই নাকি কেল্লা। রাস্তা থেকে গড়গড়িয়ে নেমে আসা যায় নদীর পাড়ে। নিচুমতন এই জায়গাটার মাটি বেশ নরম। জলের ছাপ স্পষ্ট। পা টিপে টিপে ভিজে মাটিতে হেঁটে উঠে আসলাম একটা ইঁটের চাঙরে। পাশ থেকে উঠে গেছে সোজা থাম। এটা বোধহয় জাহাজঘাটা ছিল।

……পায়ের তলায় ঢেউ উথাল পাথাল। দূরে পালতোলা জাহাজের মাস্তুলে একা চিল। ভোররাতে কামানের গর্জনে কেল্লার ঘুম ভাঙতো।……

একটু দূরে জেলে নৌকোটা ঢেউয়ে টাল খেল। সনসনে হাওয়ায় পিছল ইঁটের ওপর সতর্ক পা রেখে পাড়ে নেমে আসি।

সামনেই মূল দুর্গ। এখন কতগুলো ইঁটের ঢিবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠে যাওয়া যায় ওপরে, দুর্গপ্রাকারে। সার দিয়ে কামানের আংটা। কোনোটা আবার ভেঙেচুরে সাপের গর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার নম্বর তোরণের গোড়াতেই প্রাচীরে চৌকো গর্ত দেখে থমকে দাঁড়ালাম। ঘুপচি স্যাঁতস্যাঁতে সুঁড়িপথ দিয়ে যাওয়ার সময় বুক ধক-ধক করে জানান দিচ্ছিল—কিছুই জানান দিচ্ছিল না কেননা ভেতরে অ্যাড-ভেঞ্চারের চেয়ে কিছু বেশি ছিল ঘন অন্ধকার। একা; ভীষণ রকমের একা করে দিয়েছিলো ওই কালো। একপাশে একটু ফিকে আলো—যেন জীবনই উঁকি মারল। পথ—পথ আর নেই বললেই চলে। এত চাপা যে

হামাগুড়ি দিতে হয়। কনুই আর হাঁটুতে কাদা লাগতেই বুঝলাম নদীর খুব কাছে এসে পড়েছি। মাথার ওপর সেই আলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ভ্যাপসা গরম থেকে একমাথা খোলা হাওয়ায়। কব্জির চাপে বেশ কুঁথেকুঁথে একটা চওড়া চাতালে উঠে আসলাম। ধুলো কাদা ঝেড়ে একটু খুঁজতেই তোরণের মাথায় ওঠার রাস্তা পাওয়া গেল। একটা ইঁট বার করা চমৎকার সিঁড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোরণের ওপর…ঠিক মাঝামাঝি একটা দেওয়াল। সেই দেওয়ালের ওপাশে…

…হ্যাঁ, সেই দেওয়ালের ওপাশে তাকিয়েই একটানা সনসনে হাওয়া থমকে ঠোঁটে আঙুল রাখলো। তোরণের নীচে ঢেউয়ের শব্দ হঠাৎই চুপ। বুক নিঃশব্দে দলা পাকিয়ে কণ্ঠায় উঠে আসে। নিঃশ্বাসের শব্দ শুধু ফিস্ ফিস্।

অথচ এমন কিছুই ছিলো না ওপাশে। ঝটপট করে উড়ে যাওয়া কয়েকটা শকুন ; আর, আর একটা মুখ। মানুষের। মরা মানুষ। চোখ নেই। কালচে রক্ত জমে আছে গোল গোল দুটো গর্তে। সামান্য ফাঁক করা মোটা ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়ানো রক্ত। জমাট। মাছি ভন ভন। কণ্ঠার কাছে একটা রক্তাভ গোল ক্ষত।

একতাল দলাপাকানো চিৎকার গলায় আটকানো। বুকের কাছে একটা চিন্‌চিনে অস্বস্তি ক্রমশঃ সারা শরীরে…। সবকিছু আশ্চর্য রকম চুপচাপ। যদি ঘুম ভেঙে যায়…? নেমে আসা খুব সোজা ছিল না।

অবশেষে ; কালোপীচের টানা রাস্তার দু'পাশে অনেক মুখ। কেল্লায় একটা লোক মরেছে সে খবর পুরনো। কাল সকালেই পুলিশ আসবে। চায়ের দোকানে বসতেই জানা গেল লোকটা বিষ খেয়েছিলো। "শকুনে চোকটা খুবলে নেয়েচে, এক্কেরে অক্কাঅক্কি।" এক বুড়ো বিড়িতে টান দিয়ে অলস গলায় টেনে টেনে বলল, "কেন ম'ল কে জানে।" চুপচাপ। অনেক দূরে নদী থেকে ভাঙা ভাঙা গলায় কেউ একটা ভাটিয়ালী টান দিয়েই হঠাৎ চুপ করে গেল। এক শৌখিন রিক্সাওলা খালি চায়ের গেলাস ঠক্ করে নামিয়ে রেখে তেতো গলায় ফুট কাটল, "শালার পেরেম ফেরেম হবে।"

একগঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে পায়ে স্রোতের কলধ্বনি ছিল নিবিড়। তীব্রতর হচ্ছিল সে জলের টান। মোহনায়। চাপড়া চাপড়া মেঘ তখন সূর্যের ওপর। পাথর বাঁধানো ঢালু পাড়ে হাতে মেলে ধরা ভিজে গামছা নিয়ে একা মাঝি। দমকা হাওয়ায় গামছা উড়ছিলো নিশানের মতো। বুকের ঢিব্‌ঢিব্ ক্রমে বাতাসের সোঁ সোঁ হয়ে টানছিলো পিছনে। সারি সারি ঢিবি, একা থাম, একটা লাশ!

পীচধূসর রাস্তা থেকে আবার সেই ঢালু পাড়। নরম নদীর তীরে পা বসে যায় অল্প অল্প। এক, দুই, তিন, চার নম্বর তোরণ ঐ উঠে গেছে খাড়া। ঋজু, নিথর। একজন মানুষও নিথর নিঃসঙ্গ পড়ে রয়েছে একাকী দুর্গ তোরণের মাথায়।

সেই ভাঙা চোরা দেওয়ালের ওপাশে এবার প্রথমেই দুটো পা। কঠিন, দৃঢ়। চামড়ার চটির ছেঁড়া স্ট্র্যাপ শুধু হাওয়ায় থির্ থির্ কাঁপছিল। হাত দুটো আলগোছে ছড়ানো। অন্যমনস্ক। যেন স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

…খুব ভোরে বাগচীর মাঠ তখনও কুয়াশা জড়ানো। লাল ইঁট বাঁধানো পথে ইসকুল যাওয়ার সময় সাইকেলে টিং টিং ঘণ্টি বাজিয়ে চলে যেত সুধাংশু মাশ্‌শাই! মা পূজো সেরে ভিজে হাতে চন্দন ছোঁয়াতো গলার নিচে—কণ্ঠায়।…

চিৎ শুয়ে থাকা লোকটার কণ্ঠায় একটা গোল রক্তচন্দনের টিপ। ঠিক ওইরকম। বেলাশেষের সূর্যও মেঘে মাখামাখি হয়ে খুব লাল। টানটান থুত্‌নি। উদ্ধত কপাল। থম্‌কানো ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত ব্যথায় টনটন। চোখ? রক্ত জমাট দুটো গহ্বর শুধু চুপ!

…দুপুরে কাঁঠাল পাতা ঝরত টিনের চালে, কুয়োতলায়। কাঁচা পেয়ারার কষাটে স্বাদ। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে নজরে পড়ত ঝুঁকে পড়া নারকোল গাছ।…লোকটা কি খুব একা ছিল? একা একা?

তোবড়ানো হেণ্ডোলিয়ামের বাটির মত থম্ থম্ আকাশ। ঝুনো নারকেলরঙা জল একটানা বয়ে চলে মোহনায়। সোঁদা গন্ধ মাখা সন্ধ্যার হাওয়া ঝাপ্‌টা মারছে শার্টের কলারে, চশমার কাঁচে, ঠোঁটে। হাওয়া নয়। জল। চশমার কাঁচ তাই বোধহয় ঝাপসা। ভিজে গাল। ঠোঁটে নোনতা স্বাদ। এ জল সমুদ্রের। তাই লোনা। মোহনার কাছে, খুব কাছে, চারদিক ঘিরে শকুন উড়ছে এইবার।

প্রজন্ম

অমিতেন্দু পালিত

জানালার ফাঁক দিয়ে ফুলকাটা রোদ মেঝের অনেকটা অধিকার করে নেয়। গণ্ডীটা অনেকদিন লক্ষ্য করেছেন সৌম্যশেখর। আরামকেদারা অবধিই। পরিবর্তন কোথাও কোথাও খাপ খায় না—যেমন রোদের ক্ষেত্রে। সত্তর বছরের ওপর এই ঘরে একই পরিধিতে রোদের আনাগোনা অনুভব করছেন। চরিত্র বা আকারে ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি। আজ তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল বয়স হয়েছে রোদের। কোনো কারণ কাজ করেনি এই চিন্তার পেছনে। যুক্তিহীন চিন্তা সৌম্যশেখরের ধাতে নেই—প্রত্যেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে তিনি অবসরে বিশ্লেষণ করেন, ভেঙে চুরে গ্রহণ করেন তাদের নির্যাসটুকু। এই মানসিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আজকের চিন্তা যথেষ্ট অস্বাভাবিক। তবে কি ভীমরতি!—না বোধহয়, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে এলেন সৌম্যশেখর। বয়সকে অগ্রাহ্য করেননি কখনো, অবশ্যম্ভাবী ঘটনাদের নিয়েছেন সহজভাবেই। সম্ভবতঃ বয়সের ভারই পাল্টে দিয়েছে চোখের রঙ।

বারান্দায় বসে ছিলেন সৌম্যশেখর, চায়ের কাপ আর অলস চিন্তা নিয়ে। পরশুদিন পাওয়া টুব্‌লুর চিঠিটা মাঝে মাঝেই অন্যমনস্কতায় ঠেলে দিচ্ছে। সকালে উঠে ক্যালেণ্ডার দেখার অভ্যেস গত পঁয়ষট্টি বছরের। আজ, তারিখটা দেখার পর থেকেই অতীতের হাতছানি উপেক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে চলেছেন। শৈশব, স্কুলজীবন, কলেজ, চাকরী, বিবাহ—বেশ সুন্দর ধাপে ধাপে ওঠা। এখন নিশ্চিন্ত অবসর। ভবঘুরে স্মৃতি নিয়ে আসে মৃণালকে। কল্যাণ আর শর্মিলা। এবং অবশ্যই টুব্‌লু। বুক-কেসের উপর রাখা, পাঁচজনের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা রোজ নিজের হাতে ধুলোমুক্ত করেন। মৃণাল, কল্যাণ, শর্মিলা—ফ্রেমের বাইরে আসতে অপারগ। চৌধুরী বংশের তিন প্রজন্মের মাঝের অংশ বিলীন হয়ে গেছে। মৃণাল আর শর্মিলার স্মৃতিতে ঝাপসা প্রলেপ। টুব্‌লুর জন্ম দিতে গিয়ে পুত্রবধূ শর্মিলার মৃত্যু। পঁচিশ বছর হতে চললো। তিন বছর পরে মৃণাল। কোথায় যেন পড়েছিলেন ধূমপায়ীদের স্ত্রীদের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে। আজ অবধি তিনি ধূমপান করেননি, অথচ তাঁর স্ত্রী মৃণালেরই হল লাংসে ক্যান্সার। কিছু বেখাপ্পা প্রশ্নের উত্তর সৌম্যশেখরের কঠোর যুক্তিবাদকেও অগ্রাহ্য করে যায়।

পাঁচ বছর পর ছেলে কল্যাণের হারিয়ে যাওয়াও ভেতর থেকে মানতে পারেননি। টুব্‌লু তখন আট। জুলাই-এর এক অঝোর সন্ধ্যায় আকাশবাণীর সংবাদপাঠকের কণ্ঠস্বর অবহিত করেছিল প্লেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে। ষাট বছরের প্রৌঢ় সৌম্যশেখর সেদিন হাসিমুখে নাতির আব্দার রাখতে রাখতেই সম্পন্ন করেছিলেন পিতার কর্তব্য। স্বপ্নে এখনো ভেসে আসে বিকৃত হয়ে যাওয়া কল্যাণের সুগঠিত অবয়ব। সনাক্ত করার মুহূর্তে সৌম্যশেখর পৃথিবীর মানুষ ছিলেন না। দুঃখ, হতাশা, শোক—ইত্যাদি শব্দগুলো তখন তার অভিধানে ভীষণভাবে থেকেও তাকে স্পর্শ করতে অপারগ। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখা, টুব্‌লুর আট বছরের নরম ছোঁয়াই কি তাকে শক্ত করেছিল? হয়তো। পরবর্তী অধ্যায়ে টুব্‌লু তাঁকেই চিনেছে বাবার মতো করে। জীবনে দ্বিতীয়বার পিতৃত্বের দায়ভার তুলে নিয়েছিলেন। ক্রমশ পাল্টে যাওয়া মূল্যবোধগুলোর মধ্যেই আবার জীবনকে গড়ে উঠতে দেখা।

শীতের সকালে রয়েছে অবধারিত বিষণ্ণতা। উল্টোদিকের ফুটপাথে বকুল গাছটা রঙ ঝরিয়ে সুসময়ের অপেক্ষায়। প্রায় জুড়িয়ে আসা চায়ের কাপে ইতস্ততঃ চুমুক ঢাললেন সৌম্যশেখর। তাঁর আদরের টুব্‌লু আজ পরিপূর্ণ রক্তমাংসের। নীল আকাশের বুকে হেঁটে আবার স্বদেশে ফেরা, আজই। যেদিন নিউ ইয়র্কের প্লেনে তুলে দিয়ে আসেন টুব্‌লুকে, বাড়ি এসে হঠাৎই এক অপরিসীম শূন্যতা বোধ করেছিলেন। 'ভালো থেকো দাদুভাই'—টুব্‌লুর প্রণামের উত্তরে এর থেকে বেশী কিছু আসেনি। ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটার দিকে বাড়ী এসে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন। বুঝতে পারেননি কখন ঝাপসা হয়ে এসেছে মৃণালরা।

হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে চশমাটা তুলে নিলেন। বহুক্ষণ আগে ফেলে যাওয়া কাগজটা এখনো অচ্ছুৎ অবস্থায়। কিছু কিছু অভ্যেস ছাড়া বেঁচে থাকাটা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে—খবরের কাগজ তাদের অন্যতম। নিয়মিত পাতাদের উল্টে-পাল্টে অবশেষে রবিবারের ক্রোড়পত্রে। আন্দামান সেলুলার জেলের ছবি—অতীতের ধাক্কা। শৈশবের টুকরো টুকরো আনকোরা স্মৃতিগুলো নাড়া দিতে ব্যর্থ হয় না। স্বদেশী হাওয়ার শিহরণ অনুভব করেছিলেন একসময়। চরকায় সুতো কাটা, জাতীয়তাবাদের মিছিল, খদ্দরের উন্মাদনা—সোনার খাঁচায় নিমেষে উড়ে যেত দিনগুলো। চলতি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে পরে অনুতপ্ত হতে হয়নি। আদর্শকে আদর্শ বলেই চিনেছিলেন, আয়নায় উল্টো মেজাজে দেখেননি। 'পেট্রিয়ট' শব্দটা আজ অভিধানের বাইরে চলে গেছে। চারপাশে ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে শিকড় গাঁথতে দেখে বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে। অস্থির জীবনযাত্রায় খাপ খাওয়াতে পারেন না। মাঝে মাঝে ভাবেন, তার সমবয়সীরা কি সবাই এখন একই চিন্তায় ? জেনারেশন গ্যাপ-এর ভিত্তি দৃঢ়তর হচ্ছে ?

নড়েচড়ে বসলেন সৌম্যশেখর। তবে কি সত্যিই ব্যবধান এত বেশী ? অনাদি বলছিল বটে সেদিন—সময় বড় দ্রুত পাল্টে যায়। সময়ের পরিবর্তন অগ্রাহ্য করেননা সৌম্যশেখর, তবু, তার মনে হয়, কোথাও একটা কিছু থেকেই যায়। মানুষ মানুষকে ঠিকই বুঝতে পারে। 'টুব্‌লুকে আগের মত করে আর পাবেনা'—অনাদির কথাগুলো উড়িয়ে দিলেও আশঙ্কার বীজ নির্মূল করতে পারেননি। জীবনের একটা বড় সময় বিদেশের মাটিতে কাটাল টুব্‌লু। চলতি হাওয়া নিশ্চয়ই ছাপ রেখে গেছে। নিজস্ব জমিতে টুব্‌লু কি টুব্‌লু হিসেবেই ফিরবে ? পৃথক অস্তিত্ব অবধারিতভাবেই বদল ঘটিয়েছে সত্তার। চলে যাওয়া আর ফিরে আসার মাঝে শুধুই সময়ের খেলা। ভেঙে গড়ে নতুন করে পরিবেশন করা।

যুক্তি ঘোরাফেরা করে নিজস্ব বৃত্তিতে। কতগুলো স্পর্শকাতর অনুভূতিকে সে মাড়িয়ে যেতে পারে না। উঠে ঘরে গিয়ে, দেরাজ খুলে টুব্‌লুর শেষ চিঠিটা বার করেন। পঁচিশবারেরও বেশী দেখছেন এটা। স্পষ্ট হস্তাক্ষর বরাবরই টুব্‌লুর গর্বের বিষয় ছিল। এখানে পাশ্চাত্য আবহাওয়ার কোনো ধাঁচ ফোটেনি। স্পষ্ট ভাষা, স্পষ্ট বক্তব্য। তিন মাসের ছুটিতে আসছে টুব্‌লু। আমেরিকা যাবার পর তার এই প্রথম প্রত্যাবর্তন। নিছকই কোনো ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই সে দেশে ফিরছে—পুনঃপুনঃ বিশ্লেষণের পরও চিঠির বয়ান থেকে এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না সৌম্যশেখর। তবুও সংশয়, আশঙ্কা। আবার ফিরে এল অনাদি—'আমরা মরে গেছি হে। মরে যাওয়া একেই বলে। শেষ নিশ্বাস যখন পড়বে তখন আবার বেঁচে উঠব। ফসিল, কঙ্কালের পর্যায়ে চলে গেছি।'—তখন সদর্পে তর্ক করেছিলেন সৌম্যশেখর। জোরালো যুক্তি খাড়া করতে পারাটা তাঁর বিশিষ্ট গুণাবলীর অন্যতম। অনাদি পাল্লা দিয়েছিল, আবেগ আর গলা সম্বল করে। সৌম্যশেখরের মনে হয়েছিল বড় সহজেই আত্মসমর্পণ করছে অনাদি। জীবনকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসার পেছনে কিছু অবদান তাঁদেরও রয়েছে, তাঁরাও পথিকৃত। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মরা কৃতজ্ঞতা ভুলতে পারে, কিন্তু কৃতঘ্ন হতে পারে না। সবরকম সরলীকরণের পর মানুষ মানুষই থাকে।

দেয়ালঘড়ির ঝংকার সৌম্যশেখরকে ঠেলে দিল বাস্তবে। এগারোটা। প্রহর গড়িয়ে বেলা হয়।

শীতের নরম আলস্য জড়তা ধরে রাখে। কলকাতা শহরকে হঠাৎই শীতের সাজে দেখার ইচ্ছা। ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে গিয়েই সিঁড়ি। তিরিশ ধাপ। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে চোরা রোদ উঁকি মারে সিঁড়িতে। শেষ ধাপে পৌঁছতেই দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক স্বাগত জানালো। চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিলেন। অল্প হাঁপিয়ে পড়েছিলেন সিঁড়ি ভেঙে। এই কায়িক শ্রমই বয়সটা মনে করিয়ে দেয় বারবার। মেনে নেওয়াই ভালো। আপস প্রতীক্ষায় থাকে, একসময় তাকে গ্রহণ করতেই হয়। কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বে।

উত্তরদিকের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়ালেন সৌম্যশেখর। খাপছাড়া, পরিকল্পনাবিহীন, দূষিত এবং ভয়ঙ্কর প্রাণবন্ত কলকাতা—আকাশের দিকে তাকিয়ে। কলকাতার অদম্য সজীবতা মাঝে মাঝে ভীত করে তোলে সৌম্যশেখরকে। এই চঞ্চলতা হারিয়ে গেলে মানুষের বাঁচবার তাগিদও ফুরিয়ে যাবে। অতীত তখন নিশ্চিহ্ন। ডানায় হঠাৎ ঝাপ্‌টা মেরে, এক কোণে পড়ে থাকা বহুজীর্ণ মাছের কাঁটা নিয়ে পা'ড় দেয় চিল। কত স্মৃতি! 'সততই সুখের'! তাঁর বেড়ে ওঠার, প্রতিষ্ঠার পীঠস্থান কলকাতা। মৃণালের সঙ্গে প্রথম আলাপ এখানে। কল্যাণ ভূমিষ্ঠ হয় কলকাতায়। কল্যাণ আর শর্মিলার স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে কলকাতার আনাচে-কানাচে। এবং টুব্‌লুর।

পা-দুটোতে ঈষৎ কম্পন অনুভব করেন সৌম্যশেখর। আবেগকে সংযমের আড়ালে ঢাকতে আজকাল বেশ বেগ পেতে হয়। এটাও বয়সেরই দোষ। অনেক হারিয়ে যাওয়া আশার মাঝখানে নতুন কোনো আনন্দ অনুভব করে নেওয়াও শক্ত হয়ে পড়ছে। সূর্যের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। এখনও হঠাৎ আলোর সামনে পড়লে চোখ ধাঁধিয়ে যায়—যেমন গেল। একই সূর্যের কত ব্যাখ্যা! বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দর্শন আর দৃষ্টিভঙ্গী। টুব্‌লুর চোখে তিনি যে পাল্টে যাননি, সে আশ্বাস কি টুব্‌লু দিতে পারে? তাঁর চোখে টুব্‌লু যে পরিবর্তিত অস্তিত্ব নিয়ে দেখা দেবে না—এ সম্পর্কে তিনি কখনোই নিঃসংশয় নন। টুব্‌লুর মামাতো ভাইবোনেরা গতকাল যখন এসে অনুরোধ করে এয়ারপোর্টে যাবার জন্য, সঙ্কোচ কাটিয়ে সাড়া দিতে পারেননি। সেই আদি শিকড়গাঁথা আশঙ্কা। পারিপার্শ্বিক তাঁর মনে একটা প্রায় বদ্ধমূল ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। তিনদিন আগে টুব্‌লুর চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে দেরাজে সযত্নে জমিয়ে রাখা টুব্‌লুর গত পাঁচ বছরের যাবতীয় সংবাদ আবার পড়েছেন, বারবার। টুব্‌লু বদলেছে—বদলাবেই। টুব্‌লু এখন পরিণত, সংযত, হয়ত বা কিছুটা স্বার্থপরও, যতটা মানুষের না হলেই নয়। চিঠির আদান-প্রদান দু তরফেই রয়েছে। তাঁর চিঠি পড়ে টুব্‌লু কি বুঝেছে তা সম্পূর্ণভাবেই অনুমেয়। কয়েক হাজার মাইলের তফাতে থাকলে এবং মানসিকভাব বিনিময় শুধুমাত্র সাদা কাগজের দু-পিঠে সীমাবদ্ধ থাকলে যতটা দূরত্ব আসা সম্ভব—তা মেনে নিয়েই, তার বাইরেও নতুন কোন পার্থক্যের সূচনা হয়েছে, এমন কিছু খোঁজার চেষ্টা টুব্‌লু করেছে কি না সৌম্যশেখর জানেন না, তবে তিনি করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থতা সংশয়ের উপশম ঘটায়নি, বৃদ্ধিই এনেছে।—'আমাদের দুর্বলতা কোথায় জান? বিশ্বাসে। তোমার নাতি আজ তোমাকে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার বিরুদ্ধে সে অভিযোগ আনতে পারে, কিন্তু তুমি প্রতিবাদ করতে পারবে না, কারণ তোমার মাধ্যমেই সে পৃথিবী দেখছে।'—নিজের অজান্তেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন সৌম্যশেখর, অনাদির বক্তব্যের রয়েছে দৃঢ় ভিত্তি। টুব্‌লু আজ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি অনুভব করবেন পায়ের তলায় জমিটা সরে যাচ্ছে, প্রতিকারে সমর্থ হতে পারবেন না।

এলোমেলো চিন্তাদের কঠিনভাবে দূরে সরিয়ে পা বাড়ালেন সৌম্যশেখর। আবার সিঁড়িতে। ধুলোর ঘন প্রলেপ, বিক্ষিপ্ত মাকড়সার জাল আর ঝুল। সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে হঠাৎই ভীষণ একা বোধ করলেন। 'জলসাঘর' দেখেছিলেন কিছুদিন আগে, বিশ্বম্ভর রায়ের একা থেকে ক্রমশ একাকীত্বে পরিণত হওয়া। তাকে যেন হঠাৎই নিজের মধ্যে খুঁজে পেলেন। বিশাল, জনশূন্য প্রেক্ষাগৃহে, উন্মুক্ত মঞ্চে তিনি একা। একাধারে অভিনেতা, দর্শক, সমালোচক। তাঁর দ্বিধাই নাটকের উপাদান। অনাদিই তো বলেছিল—

'মরে বেঁচে থাকা আর বেঁচে মরে থাকার পার্থক্য বুঝে নেবার সময় এসেছে।' নিজেকে চেনাবার প্রয়োজনেই এই আত্মপ্রকাশ।

গাড়ির হঠাৎ হর্ণটা সম্বিৎ ফেরাবার কাজ করলো। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আবার এগোলেন সৌম্যশেখর। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে কানে এলো, তাঁর উদ্দেশ্যে মেয়েলি কণ্ঠের ডাক। টুব্‌লুর মামাতো বোন মিণ্টুর গলাটা মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যেও চিনিয়ে দিয়ে গেল। অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সম্পর্কেও সন্দেহ থাকে না। টুব্‌লু এসে পড়েছে। সাক্ষাৎকার আসন্ন। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সরল স্বাভাবিক উপায়ে হঠাৎই অতিরিক্ত শ্রম ঢালতে হয়। পথ চলা শেষ।

একতলার সিঁড়ির মুখে এসে থমকে দাঁড়াল সৌম্যশেখর। শুনতে পান সম্মিলিত অনেক জোড়া পায়ের আওয়াজ। সিঁড়ির তলায় ভেসে ওঠে অনেকগুলো অবয়ব—সাদা-কালোয় আঁকা। তারই মধ্যে সৌম্যশেখরের প্রৌঢ়, বয়সের ভারে জীর্ণ দুই চোখ, খোঁজে একজন বিশিষ্ট কাউকে। প্রত্যাশা পূরণ করে এগিয়ে আসে তাঁর প্রার্থিত। সাদা-কালো ফ্রেসকোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, রঙীন রেখায় গড়া। নিজের মধ্যে ভাঙাগড়ার খেলা টের পান সৌম্যশেখর। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সংমিশ্রণ ; সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখেন পঁচিশ বছরের কল্যাণকে, চার দশক আগের সৌম্যশেখরকে। কাঁচের ফ্রেমে আটকে থাকা শরীর এখন জীবন্ত, পরিণত হয়ে প্রতিষ্ঠিত। ভাঙনের পথে নিজেকে এগিয়ে যেতে দেন সৌম্যশেখর। উঠে আসে টুব্‌লু।

দময়ন্তী হন দময়ন্তী

অপূর্ব সাহা

তখন আকাশে প্রচুর মেঘ জমেছিল। ফুরফুরে রোমান্টিক সুখী অথবা শৌখিন মেঘ নয়, যা খানিক উদ্দেশ্যহীন কিম্বা অমূলকভাবেই ইতস্ততঃ চরে বেড়াতে পারে। বর্তমান মেঘে এক সর্বনাশা ত্রাসের বীজ ছিল নিহিত। যাবতীয় গোপন অভিসন্ধিগুলি যেন বারবার ব্যর্থ হ'য়ে ক্ষুব্ধ বেড়ালের মতো দময়ন্তীর পারিপার্শ্বিকতায় আঁচড় কাটছিল। দময়ন্তী ব'সে ছিলেন বাড়ীর বারান্দায়। হাঁটুর ওপর মুখ রেখে তিনি কোন দেবী নন তবু বেদনাবোধে রিক্ত হচ্ছিল তাঁর স্নেহসম্পর্কিত বোধ এবং ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে আসে সম্পর্কের যাবতীয় অর্থহীনতা। বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেয় দু'পা অথবা তাঁর প্রৌঢ়তার ওপরে ভারী বুট পরিহিত সময়ের কয়েকশো জল্লাদীয় পা উপর্যুপরি তাদের কাঠিন্য প্রদর্শন ক'রে চলে। দমকা বাতাসে তাঁর চুল এলোমেলো হয়। দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত হ'য়ে ওঠে সন্ধ্যাকালীন পরিবেশসকল। এই বৃষ্টি, এই ঝড় অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সমস্ত কিছুই অত্যন্ত সুপ্রযুক্তভাবে দময়ন্তীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছিল এবং তাকে ভয়ংকরভাবে নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন করেছিল।

মৃত্তিকা—অর্থাৎ দময়ন্তীর কন্যাসম্পর্কিত নারীবালিকাটিও শৈশবে বৃষ্টির পরমপ্রিয় ভক্ত ছিল। সেহেতু বৃষ্টি আরম্ভ হবার সাথেসাথেই অধীর আগ্রহে সে তার মায়ের হাত ধ'রে তাঁকে টানতে টানতে এনে দাঁড় করাতো বাড়ীর ছাতে। শিশুটির সোনালী চুল এবং লাল ঠোঁট সম্বলিত সরলীকৃত মুখে ছিল অনাবিল হাসি, যা অনায়াসেই দেবদূত কিম্বা তৎসম্পর্কিত ধারণাকে বাস্তবায়িত করবার পক্ষে সহজসাধ্য। বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ বুকে নিয়ে দময়ন্তী মিথ্যে আকুল হ'য়ে মেয়েকে কোলে নিতেন। শরীরের সমস্ত উষ্ণতা দিয়ে মৃত্তিকাই ছিল তাঁর জীবনযাপনের শেকড়স্বরূপ। সেদিন দময়ন্তী গান গাইতেন। আর সেই সুরে বিমোহিত ছিল মৃত্তিকা তাঁর ব্যক্তিগত সুখবোধ অথবা নিজস্বতায় সাহায্যকারী অনুঘটক হিসাবেই বা।

সাম্প্রতিককালে এইসব স্মৃতি দময়ন্তীকে নির্দয়ভাবে তাড়া ক'রে ফেরে। দময়ন্তী ছুটতে থাকেন দ্রুত। তাঁর সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। মৃত্তিকার অনুপস্থিতি তাঁকে যারপরনাই অস্থির ক'রে তোলে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আসে তাঁর মন। বিভাসের সঙ্গে আইনানুগ পৃথক হবার স্বীকৃতিলাভের পর যেহেতু মৃত্তিকাই ছিল তাঁর জীবনযাপন; তাই এহেন মৃত্তিকা যখন পরিবর্তিত হ'তে থাকে ক্রমশঃ জেদী এবং বঞ্চনার কাঠগড়ায় আসামী হিসাবে তাঁকেই মৃত্যুদণ্ড দিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত না হবার মতোই তার মুখাবয়ব—দময়ন্তী ঝুরঝুরে বালির ওপর হেঁটে যান নিঃসীম সমুদ্রকে পাশে রেখে। অবশ্য সমুদ্রের লোনা জল এবং অক্ষিগোলক নিঃসৃত বেদনার্ত রসের অবস্থানগত ফারাক বিস্তর, এ সত্ত্বেও নিজস্ব আত্মাই মানবের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, এ কঠিন অথচ বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালেও প্রাণপণ অস্বীকারের একটা আপাতপ্রচেষ্টা থাকবেই মানবিক মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক ইত্যাদির রঙীন মোড়কস্থ। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে এই দুই সত্ত্বার স্পেনীয় ক্রীড়া হে আধুনিক এ সভ্যতারই দান। সুতরাং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যা বেরিয়ে এল 'দময়ন্তী হন দময়ন্তী' তা। তথাপি এই শ্বাশ্বত বাক্য এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা নিতান্ত অন্যায্য হ'তে পারে যেহেতু দময়ন্তীর জীবনযাপন সম্পূর্ণতঃ ছিল সন্তানকেন্দ্রিক। উপরন্তু বিভাস প্রায়শই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে 'বিরোধের স্পর্শে মন জাগ্রত হয় এবং মিলনের কোলে তা ঘুমিয়ে পড়ে', কিন্তু সাংসারিক অভিঘাতে এই মত তাদের ক্ষেত্রে আদৌ সুখকর অথবা শান্তির হয়নি যে তা প্রমাণিত সত্য। পরবর্তীকালে মৃত্তিকাতে স্বপ্নবীজ প্রোথিত হয়

পিতৃতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজ কাঠামোয় এক রমণী দময়ন্তী দ্বারা। নিজ স্বাতন্ত্র্যকে জীইয়ে রাখবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার ইতিবাচক দিকটি উদ্ভাসিত হয় তাঁর বাৎসল্যসুলভ শিশুপালনের ইতিহাসে।

মাসী সম্বোধনে উত্তুরে হাওয়ার মতোই ঘরে ঢুকে পড়ে নিশা। তার আধো উচ্চারিত সোরগোলে দময়ন্তীর হৃদয়াভ্যন্তরস্থ ফ্ল্যাটবাড়ীর দরোজা তথা মানবীয় প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি খুলে যেতে থাকে। পার্শ্ববর্তী গৃহকর্তার নিছকই অনুকম্পাবশতঃ ইত্যকার বালিকাটি দাবানল হয়তো বা জেলেছে। ঠোঁট, নাক, চোখ ইত্যাদি শারীরিক বৈশিষ্ট্যে মৃত্তিকাসুলভ সাদৃশ্যহেতু দময়ন্তী শিশুটিকে আকর্ষণের চেষ্টা করেন। সেহেতু পঞ্চতারকামুদ্রিত আধুনিক লেহ্যবস্তুটি তার নজরে আনবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। শিশু আনন্দিত হলেও পরবর্তী সময়ে দময়ন্তীর আবেগপ্রকাশ তার কাছে নিতান্তই অর্থহীন মনে হয়েছে। পাখী দেখবার অজুহাতে নিশা নাম্নী বালিকাটি টলোমলো পায়ে ঘর পার হ'য়ে উঠোন, বাগান এবং অতঃপর অদৃশ্য হল। দময়ন্তী কিয়ৎক্ষণ নির্বাক থাকবার পর নিজস্ব টেবিলে ফিরে আসেন। এক পাত্র ঠাণ্ডা জল পান করেন। লেখা হয়—

মানবমাত্রই নিজস্ব আত্মাকে অধিক ভালোবাসিয়া আসিতেছে।

এভাবেই—

প্রথমতঃ, মানুষ নিজেকে ভালোবাসে।

দ্বিতীয়তঃ, স্বার্থসম্পর্কিত গুটিকয় মানুষকে ভালোবাসে। (পিতামাতা সম্পর্কটি বিতর্কের বিষয়) উদাহরণতঃ আত্মতৃপ্তি চরিতার্থতায়—প্রেম।

তৃতীয়তঃ, নিজস্ব আত্মার প্রতি বিশ্বাসী হ'য়েই হয়তো বা কেউ কেউ বৃহৎ জনগণে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। ফলস্বরূপ একেবারে আসলের মতো সুখ। এরপর মার্কসবাদ সম্মত মন্ত্রীত্বলাভে মুখ্যমন্ত্রী অথবা শান্তির গ্যাসীয় বেলুন সোজা শহীদ মিনার হইতে চাঁদের দেশেই।

দময়ন্তী আকণ্ঠ পান করার পর নিজেকে মেলে ধরেন ভবিষ্যের দিকে। দৃষ্টিপথে শুধুমাত্র নিঃসীম নিলীমা। 'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হ'য়ে আকাশে আকাশে'। তিনি ভীষণ সরল হ'য়ে যান। শিশুর মতো অকারণে অশ্রুপাত হয়। বুকের মধ্যখান জমাট বাঁধে দুঃখরূপ শীতলতায়। দময়ন্তী শাড়ির আঁচল জড়ান শরীরে। শৈত্যপ্রবাহে কুঁকড়ে আসে তাঁর শরীর। ঝম্‌ঝম্ এবং অন্যান্য সমধর্মী কাল্পনিক শব্দসহ বৃষ্টি হলে দময়ন্তী স্নাত হন। বজ্রপাত হয় ভীষণ শব্দে। উদ্যানে নেহাতই অযোগ্য কাদা জন্ম নেয়।

দময়ন্তীর প্রত্যঙ্গসমূহ এরপর খুলে ফেলতে থাকেন দময়ন্তী নিজেই। ডানহাত খুলে রাখেন আলমারীর প্রথম তাকে। ডীপ্‌ফ্রীজে ঢুকিয়ে দেন নিজস্ব জিভ। পদদ্বয় বইয়ের সেল্‌ফে সাজান বাঁকুড়ার ঘোড়া কিম্বা কৃষ্ণনগরীয় পুতুলের মতো। চোখদুটো খুলে নিয়ে সদর দরজার দেয়ালে চৌকাঠের মাথায় সেঁটে দেন। তীক্ষ্ণ খবরদারী এখন তার।

দময়ন্তী হাসতে থাকেন। নিঃশব্দ হাসিতে ব্যঙ্গ ঝরায় যেন। মাঝে মাঝে চম্‌কে ওঠেন আর বাঁ-হাতে খুঁজতে থাকেন হয়তো বা মৃত্তিকার স্পর্শ। একা এবং একাই।

প্রাসঙ্গিকী

১৭০টি বছর গড়িয়ে গেল। কলেজের ইতিহাস এই সুদীর্ঘ সময়ে কখনো সমস্যাকেন্দ্রিক, কখনো গৌরবময়। পুরু লেন্সের গম্ভীর অধ্যাপকের ক্লাশ, ক্যান্টিনে, করিডরে উচ্ছলতা, পোর্টিকোয় ঠেস দিয়ে বসে অক্লান্ত আলাপচারিতা—এভাবেই ক্রমশঃ দুপুরগুলো কেটে যায়—সুখে-দুঃখে আনন্দে হতাশায়। কলেজ স্ট্রীটে আরওয়াল গণহত্যার প্রতিবাদে দুরন্ত তরুণের মিছিল, কফি হাউসে গনগনে আগুনের মতো ঝলসানো, কলেজ স্কোয়ারের জল বদলানো, নতুন ঘাস বীজ বোনা হয় মাঠে—সব মিলিয়ে—কলেজ পাড়া—সব মিলিয়েই আমাদের অনেক গর্বের আর আনন্দের কলেজ।

বিভাগীয় সংবাদ

অর্থনীতি ঃ

বিভাগের অধ্যাপিকা অমিতা দত্তের অবসর নেওয়ার পর এখনো তাঁর শূন্যপদ শূন্য রয়ে গেছে। সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজের নানান গবেষণা প্রকল্পে ৬ জন জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপক ডঃ এম. কে. রক্ষিত হেলসিঙ্কি ও বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট ইকনমিক রিসার্চে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগ দেন। স্নাতক পরীক্ষার ফল খুবই ভালো।

ইংরেজী ঃ

বি. এ. পরীক্ষার ফল অভূতপূর্ব। সেমিনার লাইব্রেরী নতুন করে সাজানো হয়েছে। যুদ্ধের কাব্য বিষয়ে একটি আলোচনা সভাও করা হয়। ডঃ সুকান্ত চৌধুরী পশ্চিম বার্লিনে আন্তর্জাতিক সেক্সপীয়র সংঘের পঞ্চবার্ষিক সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

ইতিহাস ঃ

পরীক্ষার ফল ভালো। প্রধান অধ্যাপক ডঃ রজত রায় এ বছর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ.জি.সি. সেমিনারে ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

উদ্ভিদবিদ্যা ঃ

বিভাগের স্নাতকশ্রেণীর ল্যাবরেটরীর আন্তসংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক লাইন এ. সি না হলে অনেক যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। বিভাগের নিজস্ব মালী না থাকায় প্রাকটিক্যাল ক্লাশে মেটিরিয়াল যোগানে বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়েছে। পরীক্ষা ফল ভালোই।

গণিত ঃ

বিভাগের চূড়ান্ত স্থানাভাবের জন্য আন্দোলনের ফলে পুরনো একটি লেকচার থিয়েটার সারিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে স্থানাভাব রয়েই গেছে। অসম্পূর্ণ পার্টিশানেই এক ঘরে দুটি ক্লাশ চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে 'হ্যালী'র সুবাদে একটি তিন ইঞ্চি টেলিস্কোপ পাওয়া গেছে। পরীক্ষার ফল বেশ ভালো।

দর্শন ঃ

বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা বেরোচ্ছে নিয়মিত। বাংলা বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে এই বিভাগ রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করে। ডঃ নীরদ বরণ চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে একটি সর্বভারতীয় সেমিনারে বিশেষজ্ঞরূপে আমন্ত্রিত হন। পরীক্ষার ফল উল্লেখযোগ্য।

পদার্থবিদ্যা ঃ

ডঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী ইউ. জি. সি. প্রফেসররূপে নিযুক্ত হয়েছেন। বিভাগের ল্যাবরেটরীর আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। পরীক্ষা ফল আগের মতোই ভালো।

প্রাণিবিদ্যা ঃ

বিভাগের বিভিন্ন শাখার গবেষণার ধারা পূর্ববৎ চালু রয়েছে। অধ্যাপক ডঃ এস. আলম গবেষণাপত্র জমা দিয়েছেন ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য।

বাংলা ঃ

দেওয়াল পত্রিকা নিয়মিত বেরোচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা বসন্ত উৎসব করেছে। রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। অধ্যাপক প্রশান্ত দাশগুপ্ত বাংলা আকাদেমীর সাধারণ পরিষদের সদস্য মনোনীত হয়েছেন। অধ্যাপক ডঃ স্বরাজব্রত সেনশর্মা কলম্বোতে আয়োজিত কমনওয়েলথ সাহিত্য বিষয়ক সেমিনারে যোগ দেন।

ভূগোল ঃ

বিভাগের অধ্যাপক জয়দেবকুমার কোলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. লাভ করেছেন। নরওয়ের একটি প্রতিনিধি বিভাগ পরিদর্শন করেন। তৃতীয়বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষেত্রসমীক্ষণের জন্য আগ্রা, রাজস্থান, দিল্লী ও সংলগ্ন এলাকায় গিয়েছিল। পরীক্ষার ফল ভালো।

ভূতত্ত্ব ঃ

COSIST ও SAP (DSA) প্রকল্পে মঞ্জুরীকৃত অর্থে বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। "ভূ-বিদ্যা" পত্রিকা এখন যন্ত্রস্থ। জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে বিভাগের ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানটি প্রশ্নোত্তরের আসর ও সেমিনারের আয়োজন করেছিল। পরীক্ষার ফল উল্লেখযোগ্য।

রসায়ন ঃ

বিভাগের তিনজন অধ্যাপক পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেছেন। ডঃ পরিমল সেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতকোত্তর শিক্ষার একশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রসায়ন বিভাগে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের আলামনি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১২৫-তম জন্মদিবস পালন করা হয়েছে।

রাশিবিজ্ঞান ঃ

আলোচ্য বছরে বিভাগের অধ্যাপকগণ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ইউ. জি. সি. সেমিনারে অংশ নেন। পরীক্ষার ফল বরাবরের মতোই ভালো।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঃ

বিভাগের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। বিভাগের প্রধান ডঃ অমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সমাজ বিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক ইংরেজি Socialist perspective চৌদ্দবছরে পড়ল। প্রয়াত প্রাক্তন অধ্যাপক নির্মলকান্তি মজুমদারের স্মরণে শোকসভার আয়োজন করা হয়।

শারীরবিদ্যা ঃ

বিভাগীয় দেওয়ালপত্রিকা 'প্রাচীরিকা' প্রকাশিত হচ্ছে। অধ্যাপক শ্রীদেবজ্যোতি দাশ জাতীয় পর্যায়ে জীববিদ্যার একটি পাঠ্যপুস্তকের লেখকমণ্ডলী NCERT কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন। বিভাগে গবেষণাকক্ষে তীব্র স্থানাভাব, শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য অর্থবরাদ্দের অপ্রতুলতা, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ অনিয়মিত হওয়ায় পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে।

হিন্দী ঃ

বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা 'দশরত্ন'-এ একে একে প্রয়াত আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল, ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র ও রাষ্ট্রকবি মৈথিলচরণ গুপ্তের শতবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী বিভাগ তার পঠনপাঠন ছাড়াও সহ-পাঠ্যক্রম কার্যসূচীর মধ্য দিয়েও তার উৎকর্ষের আদর্শ তুলে ধরেছে।

গ্রন্থাগার

ছাত্র সংসদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে গত বছর গ্রন্থাগারের বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হয়। আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৮৫-৮৬ সালে আর্টস্ গ্রন্থাগারের বৈদ্যুতিকরণের ফলে আলোর সমস্যা মিটেছে। অথচ স্থানীয় পি ডব্লিউ ডি বিভাগকে পাখা লাগানোর জন্য বারংবার তাগাদা দিয়েও এখনো পাখা লাগানো হয়নি। এই প্রচণ্ড গরমের দিনে গ্রন্থাগারে কাজ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

নিয়মিত ঝাড়পোঁছ না করার জন্য কলেজ গ্রন্থাগারের বেশ কিছু অমূল্য সম্পদ অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বছরের পর বছর ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দুজন 'ফরাস' নিয়োগের আবেদন জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। এ বিষয় অতিশীঘ্র কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান হচ্ছে।

ছাত্র সংসদ চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের কাজের ধরন ও দায়িত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁদের বেতন পুর্ণবিন্যাসের আবেদন জানাচ্ছে। অধ্যক্ষ মহাশয় বিভিন্ন সময়ে পত্রের মাধ্যমে ঊর্দ্ধতন বিভাগকে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবগত করার নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন। এর একটা আশু নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। স্থানাভাব ও অন্যান্য অসুবিধা দূর করার জন্য পৃথক্ গ্রন্থাগার গৃহ নির্মানের ব্যাপারে সম্প্রতি নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

অন্যান্য খবর ঃ

ইডেল হিন্দু হোস্টেলের একশ বছর ঃ

'৮৬-র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হ'ল কলেজ সংলগ্ন ইডেন হিন্দু হোস্টেলের শতবার্ষিকী—গত ২৯, ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর। শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক নুরুল হাসান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। আন্তঃ ছাত্রাবাস বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন বহিরাগত শিল্পীদের সমন্বয়ে এই তিনদিন কেটেছে দারুণ প্রাণোচ্ছলতায়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল Walking down the memory Lane নামক স্মৃতিচারণের অনুষ্ঠানটি।

'দ্রিঘাংচু' ও 'মিলিউ' ঃ

কলেজ উৎসব। কলেজের ভেতরে। কলেজের বাইরের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। এবার নাম বদলেছে। পুরোনো 'মিলিউ' ফিরে এসেছে। 'দ্রিঘাংচু' এবার ছিল অন্তঃকলেজ উৎসবের নাম ১৭ই, ১৯শে ফেব্রুয়ারী। আন্তঃকলেজ উৎসব 'মিলিউ' হয়ে গেল ২০, ২১ আর ২২শে ফেব্রুয়ারী। গতানুগতিক। যেমনটি হয়, তেমনিই। নিস্তরঙ্গ। কলেজে অক্সেনিয়ান আর স্প্যানিশ অ্যাকসেন্ট ক'দিনে কিছু বেড়ে ছিল। দেবদারু গাছের তলায় কিংশুকের নেতৃত্বে 'গরম পানীয়ের' বিক্রি বোধহয় এবার একটু অন্যরকম ছিল। পাশাপাশি খোল আর মাদল নিয়ে 'বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়ে'র ছেলেমেয়েরা মেতেছিল লোকগীতি, বাউল আর গণসঙ্গীতের সুরে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হয়েছিল থার্ড থিয়েটার। এমনি করেই কেটে গেল। মাঝের দিনে, কারো কারো অভিযোগ, পাশ্চাত্য সংগীতের অনুষ্ঠানে উচ্ছলতার থেকে উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রাই ছিল বেশী।

খুচরো খবর ঃ

এই গরমেও প্রমোদের ক্যান্টিনে আড্ডা নিয়মিত জমছে। কোল্ড ড্রিংক্‌সের একই বোতল থেকে একসাথে পাঁচজনের স্ট্র দিয়ে খাওয়া বরাবরের মতোই অব্যাহত। কলেজ প্রতিষ্ঠাতৃ দিবসের বৃক্ষরোপণ—বৃক্ষ দেখা মুশকিল। ক্যান্টিনের ওয়াটারকুলার আপাততঃ নট্ নড়ন-চড়ন। এই প্রাসঙ্গিকী লেখার সময় পর্যন্ত জানা গেছে আগামী একমাসের আগে ঠাণ্ডা জলের পাত্তা পাওয়া যাবে না। আর্টস বিল্ডিং এর নীচের বহুদিনের ভাঙ্গা একটা ওয়াটার-কুলার অবস্থান ত্যাগ করেছে—শোনা যাচ্ছে ওখানে মূর্তি ইত্যাদি বসানো হবে। প্রমোদদার নেতৃত্বে ক্যান্টিনের পুরোনো সব পোস্টার ছেঁড়া হ'লেও টুকটুক করে আবার পোস্টার পড়ছে। পোস্টারে এমনকি সবুজ ঢে'ড়শও দেখা গেল। কলেজের সবদিকটা এখনো সম্পূর্ণ রঙ করা হয়নি।

জনি রয়েছে ঠিক জায়গা মতোই। ইদানীং রাত্রিবেলা বহিরাগত ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের ঘোরাঘুরি কম আছে।

'ফেস্ট'-এর সময় বিশাল টেবিলটা পোর্টিকোয় এসেছিল। এখনো দৈনন্দিন রোদ খাচ্ছে। সব মিলিয়ে মিশিয়ে চলছে, যেমন চলছিল গত ১৭০টি বছর ধরে।

চলচ্চিত্র সংসদ ঃ

কুরোসাওয়া ফেস্টিভ্যাল হয়েছে। এই সূত্রে রশোমন, সেভেন্থ মামুরাই, ইকিরু ইত্যাদি ছবি দেখা হল। কুরোসাওয়া সম্পর্কিত আলোচনাচক্রের বক্তা ছিলেন মিহির গুপ্ত, ধ্রুব গুপ্ত। মোটামুটি নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানচেতনা সমন্বয় ঃ

কলেজের এই গণবিজ্ঞান সংগঠনটি 'গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কিছু গান, কিছু কথা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করছে। গত বছর মার্চ মাসে বি. প্রেমানন্দের নেতৃত্বে ডিরোজিও হলে যে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের শুরু হয়েছিল সংগঠনের সদস্যরা এখন তাকে গ্রামের চৌহদ্দিতে নিয়ে যাবার প্রয়োজন থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কুসংস্কার বিরোধী 'অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক' অনুষ্ঠানটি প্রদর্শন করছে।

এ্যাথলেটিক ক্লাব ঃ

শমীক বসুর নেতৃত্ব এ বছর ক্লাব এগিয়েছে প্রথা ভেঙ্গে অর্থাৎ কলেজের ছেলেরা ক্রিকেট খেলেছে চুটিয়ে, বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে বিভিন্ন কলেজের সঙ্গে, অংশ নিয়েছে ইউনিভার্সিটির ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টে। দুঃখের বিষয় যদিও অনেক, তবু একটা বিরাট—অন্তঃকলেজ ক্রিকেট শেষপর্যন্ত শেষ হয়নি। '৮৭-তে ফুটবল টীম তৈরীর চেষ্টা চলছে মনোজিৎ-এর নেতৃত্বে। আশিস মণ্ডল '৮৭ এ্যাথলেটিকস্-এ স্বাভাবিকভাবেই চ্যাম্পিয়ন।

REMINISCENCES

Saibal Gupta

[Sri Saibal Gupta, Retired I.C S , and one of the most distinguished ex-Students of Presidency College, reminisces about his college days in an interview to Subha Muhkerji and Uddalok Bhattacharya.]

Q. Do you often recollect your days at Presidency College ? If so, with what feelings ?

S.K.G. Yes, I certainly do recollect my college days and I do feel a bond with Presidency College. But it must be said that in those times we never really felt at home at college, in so far as our relationship with the authorities (administrative as well as teaching) was concerned. After school, Presidency College struck us as being a formal, somewhat official place. The sense of belonging would not easily come. Nor could one get rid of the feeling that the college was yet another Govt. institution, a part of the British rule itself. The relationship of the principal with the staff, for instance, seemed to resemble that of the Boss with his subordinate officers. The students were even further distanced from the seat of authority, and in case of a conflict between a member of the library staff and a student, the former was given protection by the Principal, in preference to the just demands of the latter. [In this connection Sri Gupta mentioned an episode in which he had been personally involved, but he would rather not make the particulars public]. Similarly, the relation between the teachers and the average students was distant enough. Exceptions, of course, were there, especially in the case of outstanding students.

Q. Could you tell us something about the great teachers of Presidency College at your time ? Many of them, we hear, were institutions. Any personal recollections would be enlightening for us.

S.K.G. Yes, indeed, we had many distinguished teachers in our times, as I am sure students in every decade do. As for recollection, I remember every one of them.

[Here, Sri Gupta mentioned each one of his teachers individually, almost always giving us a vivid sketch with colourful details. Among those he specially remembers are the following ;]

S.K.G. Let me start with English. In our intermediate class, Prof. Sri Kumar Banerji used to teach us *The Passing of Arthur*. His scholarship was impressive, as was his insight, though his delivery was disappointing. Prof. Sterling did little more than read out Addison's *Spectator* in impeccable accents in class. He stood out, instead, by virtue of his meticulously well-washed and well-groomed demeanour. However, he had qualities of which we were not to be aware till much later. His sketch on his pupil Hiren Mukherji in a later issue of the College Magazine opened up a hitherto half-known facet of his character—his genuine affection for, and sense of identification with, his students. Later in his life, he donated all his life's savings to Presidency College. This left a deep impression on our young minds. Such an instance was rare anywhere, let alone among Britishers.

When we were Hons. students, I made a scramble for the first row in Prof. Manmohan Ghose's classes, though I was not an English Hons. student. Unfortunately, however, he had by that time become feeble, and was not much of a success as a teacher.

However, the most marvellous experience still awaited us. It was in the Third year that we first had Prof. P. C. Ghosh teaching us. No compliment is too high for his superb reading of *Othello*. Indeed, it was not reading but acting. I don't, of course, mean stage-acting ; his identification with the characters was so complete that the delivery itself completed half the task. It was he who opened our eyes to the infinite richness of Shakespeare and made us realize the full import of Shakespearean tragedy.

Prof. Ghose is to be remembered not only for his greatness as a teacher. but also for his personal qualities. Selections from the Bible were prescribed for us in the pass syllabus, but these had not been done even when our exam was near. Desperate, we approached P. C. Ghosh who immediately agreed to help us out. He sat with us for two to three hours at a stretch on a couple of Saturdays (which were holidays for us), and completed our syllabus.

Another of my pass subjects was Mathematics. I specially remember Sri Sarada Prasanna Das in this connection. Though he had a grave and forbidding bearing, we had the courage to ask him questions. This courage was only prompted by our confidence that he would be able to give us the answer. With many other Professors, we hesitated to make too many queries lest we should embarrass them.

In the intermediate class, one of my subjects was Logic which was taught by Prof. R. K. Dutta. He was a man whose integrity would be an example in any age. We were all struck when he resigned before time, only because he felt that his intellectual ability was on the decline and that he might be

doing injustice to the students of the college if he continued in his office. When I passed the Intermediate exam, he tried to persuade me to take up Philosophy as my Hons. subject. Though I did not do so eventually, I remember his fond encouragement gratefully.

Q. What about the teachers of your Hons. subject ? We are sure you have a lot to say about them.

S.K.G. Yes of course, I was coming to that. We had, first of all, P. D. Mukherjee who was a man of integrity. So was Atul Sen who was very frank about his inadequacies. On a particular topic, he referred me to Sri Kulada Das Gupta, an authority on that subject, because he did not consider himself sufficiently equipped to answer my queries. And above all we had Sir J. C. Coyaji—a favourite pupil of Alfred Marshal—whose exceptional scholarship has become a legend.

Q. Did the students of the college take part in politics then ? If so, what sort of politics ?

S.K.G Students of the college did get involved in politics then. But that was politics of a different kind—not the narrow, self seeking politics of today. which can only rant and demand. In our times students' politics was motivated by the sole object of freeing the country from foreign domination. No personal interests were involved. Differences of opinion were, of course, there. Some believed in the Gandhian method, some in the revolutionary way. But the larger unifying factor was the nationalist impulse.

When Gandhi started his non-cooperation movement in 1920, we were boarders of the Eden Hindu Hostel. There were few whom the event left unperturbed. There was great excitement and disturbance in the air. Total self dedication in the cause of the country was however, possible for few. I, for one, wrote to my father, asking him whether I could leave Presidency College and join the National College. But my father thought the National College to be an unrealistic scheme, and wanted me to continue with my studies. Similar were the cases of many others. The three students who actually left college were Soumen Tagore, Ajoy Mukherjee and Chapala Bhattacharya. And they did so quietly, without any ado. Few could guess from outside what fire burned within these determined youngmen. Among the Professors Sri Profulla Ghosh of the Chemistry department (later, the first Chief Minister of Bengal) was the only one who left. His devoted students Haripada Chatterjee and Annadaprasad Chaudhury followed him, but only after they had taken their final examination. However, though not everyone could respond actively to the call of the leaders, few but the most insensitive or materialistic ones remained unaffected. Everyone contributed to the

atmosphere of of intense patriotism.

Q. Is there any interesting anecdote you would like to recount in this connexion ?

S.K.G. We were students at Presidency College when Sri C. R. Das was jailed. Sm. Basanti Devi, his wife, visited the Hindu Hostel in person and tried to rouse the students : "Deshabandhu is behind the bars. Will you still remain inert ?" When J. R. Barrow, the Principal then, heard about this visit, he sent a stern circular which, among other things, stated his knowledge that 'Sm. Basanti Devi came to seduce the students'. His language provoked strong resentment and there was an instant reaction among the students. For a couple of days, classes were boycotted and students blocked the gate. When the situation got serious, Barrow brought down the huge Webster Dictionary to the gate of the Hindu Hostel and tried to convince everyone that he had used the word 'seduce' not in any objectionable sense but simply in the sense of straying from the right path !

Q. You are one of the oldest alumni of the College, and you still take active interest in the affairs of the institution. How would you compare the college atmosphere in your days with the present conditions ? Thoughts for the future, if any.

S.K.G I do not think I am in a position to make a comparison. I know little of the present atmosphere. The Alumni Association is virtually my only link with the college now. Unfortunately, the Alumni Association is not as close to the college as it should be. In fact, it should be given formal recognition by the Government as one of the elements to improve the college. It might, for instance, be a good idea to include a representative of the Alumni Association in the governing body. This will help maintain a liaison between the past and the present, to the benefit of both.

As for future thoughts, I do believe that the college should be given a special status as a centre of excellence. In fact, as President of the Alumni Association I submitted a proposal to that effect to the Governing Body. As far as I know, Sri Bhabatosh Dutta is giving the proposal serious consideration.

Lucio Piccolo : Winters Without Hearth

Swarajbrata Sen Sarma

PERHAPS no poet of so scant acknowledgement in his lifetime and so little actual poetry has been so well served in the mere six years since his death as Lucio Piccolo with the appearance of his *Collected Poems*, translated by Brian Swann and Ruth Feldman, and published by Princeton University Press.

Carlyle, in his essay on the hero as poet, said we are all poets when we read a poem well. And translators Swann and Feldman have read Piccolo well ; their renderings are all that a poet could desire, for they are buoyed and shored by the special insights into language which Swann and Feldman have. The result, in this handsome edition with Piccolo's original faced by the English translation, is a body of poems which stand in self-sufficient grace in English rather than being mere clues to the Italian.

There were nine poems in the poorly printed, privately published little volume on cheap paper which Sicilian Lucio Piccolo sent out over thirty years ago, by way of introduction, to Italy's major contemporary poet, Eugenio Montale*, in the Italian North—that almost mythical, seemingly inaccessible, but always beckoning North which looms large in a Sicilian's dream of establishing contact with the world ; the North where jobs can be had or literary fame made by those able to reach it. That gesture marked Piccolo's literary birth. And it is significant that in his one move from the isolation of his island he did not attempt to communicate with a fellow Sicilian, the Nobel poet Quasimodo, who also lived in Milan, or with Elio Vittorini, the novelist, or a score of other eminent emigrés ; he simply announced himself to Montale, a stranger and a Northerner.

As it was in the beginning, so at the end ; nine again was the number of poems elegantly published by Scheiwiller of Milan in the last collection before Piccolo's death in May 1969. And here, in the coincidence of numbers, there is the hand of the poet, for nine was, to him, a perfect number, divisible by the

---

* Just two months before his death, Montale, another Nobel poet of Italy introduced Lucio Piccolo to me in one of his letters written to me. He sent two poems of Piccolo for publication in the 'Anubad Patrika' and a booklet, titled—'Lucio Piccolo : The Birth, Death, And Re-life of a Poet'.

even more perfect three—the theme of three which, since Dante's *Comedy* in three divisions of thirty-three cantos each, all in *terza rima*, has been portentous to many Italian writers. And particularly to a person like Piccolo, immersed as he was in studies of the occult and secrets of the cabala, and attentive, as he said, to all the whisperings and signals in the dark beyond our sight. His numbers had a definite, precise importance. Was it by chance that the year of Piccolo's emergence, 1954, ends in figures which add up to nine ? And what of the number of his total life's production ?—three slim volumes of verse.

The first interview which Italian television commissioned on the poet Piccolo was to have been an hour-long production for which a whole crew was sent to the baronial villa at Capo d'Orlando in Sicily—'was to have been' because, unaccountably, the whole first shooting was lost. "Of course", remarked Piccolo when it was reported to him and a second taping arranged, "because it was done on a Friday, an inauspicious day always." And somewhere the number thirteen had figured negatively—in the number of technicians sent along or perhaps in the number of questions put to the poet. Yet for the retake, Piccolo wanted to be dressed identically as in the original. And since no one present remembered what tie he had been wearing, calls had to be put in to Milan to locate a surviving photo taken at the time of the first shooting and have it flown to Sicily so that he would be sure he was the same.

And this holding on to the past was not showy temperament or spurious ecentricity ; Piccolo's poems, as himself, also show time suspended, static, being held on to and re-evoked in resonances and touches—*L'ore sospese*, *l'ombre dei giorni*—these figures of time and substances held indefinitely in consciousness keep recurring. But everything about Piccolo is strange, mysterious, importable, full of the turns and twists of chance. And irony. An irony which must have amused him and would have, even more, his illustrious cousin, Gluseppe Tomasi di Lampedusa, if the latter had lived to see the fame his posthumous novel, *The Leopard*, achieved. For not only Piccolo, but even Lampedusa sprang full-grown, so to speak, into the Italian literary empyrean with Montale as their wondering midwife.

For if Montale had not mistakenly assumed that the unknown author of the typographically modest book of poetry was a friendless young man on his first literary venture rather than a middle-aged aristocrat of imposing cultural background, would he have presented Lucio Piccolo's book of nine poems at the literary reunion in the Lombardy watering spa of San Pellegrino that same summer of 1954 ? Probably not. For the theme of the reunion was "A Meeting Between Generations" ; a dozen or so of the most important older Italian writers, including Montale, were each to present a "new hope" of the younger generation. And

Montale decided to present the unknown Sicilian who then turned up in person, fifty-three years old, accompanied by his cousin, the Prince of Lampedusa, and their valet, to the surprise and delight of all San Pellegrino.

Montale is not an emotive man ; even so, he must have had his moment of astonishment. There was Lucio Piccolo, the learned, and mature Cavaliere di Calanovella, who read Wittigenstein and Greek tragedy in the original, had a complete musical culture (no other quality could have endeared him more to Montale, a baritone by training), and had had in years past a correspondence with Yeats. Hardly the faltering babe Montale was to hold at baptism into the Italian literary world. Piccolo knew and had read everything in all the important languages there in the solitude of Villa Piana. For all his life his only intellectual and literary companionship had been with Lampedusa ; both of them yearned to write but, captives of an indifference-indolence that is both Sicilian and aristocratic and fully fatalistic, had never brought anything to fruition. Until, that is, Piccolo had his nine poems printed in an edition meant only for his friends and on his cousin's urging (*a defi* to fate, really) sent the historic copy to Montale.

Montale told the story at San Pellegrino and repeated it as an accompaniment to the first edition of Piccolo's *Canti Barocchi* which is now carried as an afterword in the volume of translations. It was, Montale said, the 8th of April, 1954, when he received by mail an envelope stamped with 35 lire on which another 180 lire was due ; it came from Capo d'Orlando near Messina and the sender, a certain Lucio Piccolo, had favoured him with a skinny volume entitled *Nove Liriche* (Nine Lyrics). Nothing indicated who the author was ; he simply presented himself as a Sicilian who felt the need to re-evoke and fix in poetry a world (the baroque one of Sicily) which was on the eve of extinction without having ever been caught in an expression of art. His little book had been privately printed and was not in commerce. He excused himself for the intrusion.

Such books reach Montale by the hundreds each year and form piles and mounds on his library table until Gina the housekeeper silently disposes of them. But Piccolo's book didn't end in the pile.

"Perhaps", Montale explains, "I wanted to see if it were worth the extra postage I had paid for it". It overwhelmingly was. And, as they say, the rest is history ; the poetry of Lucio Piccolo represents the best of pure lyricism that has appeared in Italy in recent years.

And so Montale delivered from the silences of Sicily a mature and exquisitely developed poet to take his place in the republic of letters. And a novelist. For it is certain that if Piccolo hadn't been invited to San Pellegrino

and brought along his cousin, Lampedusa would never have been moved to write his masterpiece. So much for serendipity, or synchronization. The rest was work.

The encounter with Northern writers and intellectuals stimulated both Lampedusa and Piccolo to their best achievements. Lampedusa, who had only three more years of life, returned to Sicily to write the novel which had been haunting him for a quarter of a century and which he had never been able to begin. Piccolo produced his *Canti Barocchi* (Baroque Songs). The two cousins had much the same temperament : wit which sharpened itself on irony and self-ridicule, sense of caste, an absentmindedness and apathy to what happened "on the outside", a reserve which could have seemed either timidity or proud indifference. They amused themselves on the return trip caricaturing themselves to each other as they must have appeared to their northern confreres : two half-peasants, two awkward provincials in dark suits of old-fashioned cut and the pallor of indoor people from God knows where. But through their parody was the acute realization that contact with the Italian literary world was fundamental for what they both would have disparagingly called "action".

In one area did the cousins differ. Lampedusa was never interested in metaphysical studies or spiritism. And Piccolo recalled being laughed at by his older cousin and being told that he had heard too many *contes de ma mère l'oie* at his governess's knee when he was a boy. "He was a little afraid of that world", Piccolo said during an interview, "while I instead keep my ear attuned to the whisperings in the dark."

Lucio Piccolo believed intensely in the occult, in metempsychosis, in magic forces, in chance that plays so inexplicable a part in life. He owes his *Canti Barocchi*, he said, to a rapture which seized him in a magic period of creation. And he was bound to his home, that Villa Piana on the coast of Sicily between Messina and Palermo from which he never moved in his last years, by something which he termed a "silken enchantment."

His affinity for Yeats owed much to the feeling of magic and mystery he got from the Irish poet. And still at Villa Piana, in a curio case with glass doors, is a little coffer containing Yeats's letters which Piccolo, toward the end of his life, often regretted not being able to reread, for the lock on the coffer had jammed and instead of having it forced, he had taken it as a sign that it was meant not to be opened further in this life. For there's always the next one, the next life when, in accordance with his views of metempsychosis, his soul will pass into another form as, for example, the soul of the ancient Greek philosopher Thales whom Piccolo regarded as living on in the body of his beloved wolf dog Gip.

And what of *this* life, the life of Lucio Piccolo, Poet ? It wa solitary, static,

and to one observing it from the outside, almost unbearably sad in its avoidance of normal, human affections. It was a life lived in a kind of suffocating perpetuum of times past in a home that was a museum of relics and that housed, besides the poet, an elderly bachelor brother and an elderly spinster sister. These are the personages of the poem. "The Three Figures", who :

...climb the stairway behind the gratings
that leads to the bells,
to the neighbouring loggia –somewhat
rigid, dark against the sunset ;
they look about,
lean over the railing then
disappear.....
three
figures and a door that bangs
make day vanish,
black
and red, the eye is filled with it,
and the landscapes of the hour
revolve.

Three figures plus the changing company of fierce German wolf dogs, twenty-five of which are now settled under twenty-five white tombstones in orderly rows alongside the grove of olives, beyond the cactus garden fronting the dwelling.

They lived in the villa with their inherited collection of fine Saxon china, their publications from all over the world, their dogs and canaries and garden full of exotic plants, speaking English, French German, and Sicilian among themselves, and Italian to their occasional visitors. Piccolo's poem, "The Passage," quite perfectly catches this dusty, anachronistic, gloomy, sterile, decadent world—a passage-way where only briefly does a ray of sunlight penetrate to fall upon the dusty objects and, for a moment, enflame them ; this lonely, little used, almost useless corridor is, in fact, the image of their lives. And this deliberate alienation, this scorn of the outside world, this necessity of retreat is a Sicilian mania exasperated almost to the point of madness. They were obsessed by nobility ; all the conversation at Villa Piana began and ended on that subject. As did their lives.

Their world was Seclusion ; the shadowy, unreal world of withdrawal, of melancholy lit with contradictory flashes of baroque splendour. In contrast always with the exuberance, the colour and passion of Sicilian nature. And this is the Sicilian soul—given to closing in on itself in opposition to the light and vegetation

which surrounds it, and the splendid openness of the sea. For a Sicilian the sea around his island, the sea upon which Piccolo's villa looks, does not give release with its immensity, does not induce feelings of spaciousness and escape; the sea is Sicily's enemy, reminding each Sicilian that he lives on an island, vulnerable to attack, open to invasion, to the constant change and humiliation of ruling foreigners. And in answer, each Sicilian becomes an island, an island apart from the world in which he defends his solitude and atavistic melancholy.

Piccolo's poetry carries the weight of this melancholy, this austerity of sentiment, this seedy magnificence which is Sicily. And, as he proposed in his original communication to Montale, he has fixed it for all time. The poet's epitaph could be the lines reported by a journalist who, some years ago, went to Capo d'Orlando to interview Piccolo. It was January and, to the newly arrived northerner used to central heating, the cold seemed worse in the unheated villa than outdoors, for there is the touching belief throughout the south of Italy that the cold never arrives there and they don't need heating. It is, instead, a bone-chilling damp cold, from November to April, which outsiders are never successful in ignoring. Noting his guest's discomfort, Piccolo told him gently, "You know, the cold in these torrid lands lasts only a few days. We are all set up for summer. It doesn't seem worthwhile to us to change our habits for so little."

Nor could he change his world. It wasn't worthwhile for so little a time as this present life represented for him. His world, perforce, was illusionary—the sense of unreality strongly conveyed in his poetry—for he withdrew from immediacy and, cosseted by an equally seclusive brother and sister and the souls of various deceased gentlemen and philosophers who continued to live on in his pets, cultivated his hermeticism. "I don't care for modern art," Baron Piccolo, the poet's elder brother, once said. And he was referring not to Pop or Op or even Picasso, but to Goya.

Their eccentricity is their shudder of horror at the world. In the building alongside the villa there is a veritable stable of cars; several limousines are always kept in perfect order, with liveried personnel to drive them. But their only occupant is the cook whenever he goes into town to do the day's shopping. The Baron and the poet, should they go into town for a newspaper or cigarettes, ride bicycles or motorbikes.

But still the Mediterranean sun shines through the poetry of the recluse. And in this constant counterpart of sun and night, light and dark, there is omnipresent the eternal Sicilian theme. Piccolo's poetry is full of a melancholy sense of illusion, of loneliness and despair, and, at the same time, shot through with the language of light and sun (*raggio, brucia, fuoco, trasparenze, fiamma,*

accesa, *fulgore*), and the enchantment of sea spaces and nature.

Is this the secret yearning of the poet—of the man who gave up the world of nature and action and human affections ? Is it the desire to be reborn into the world of light he is attracted to but cannot accept in this life ? His poetry, at its finest and most movivg, seems to tremble on the brink of the discovery of another way of life, as if he were pushing at the shadows that separate him from it. A last unpublished poem seems to recognize and regret the repressions he had cultivated throughout his life and to want (desperately knowing, perhaps, in his deepest soul, its impossibility) to join himself to others, to life. He speaks of revived echoes, the sob drawn from him, the voice which binds one to others, and, symbolically of his own painful life, "winters without hearth."

Piccolo's first published collection after San Pellegrino was *Canti Barocchi* and the descriptive adjective of the title, baroque, was taken to describe not only the florid, overcharged, image-crammed, expansive, sumptuous mobility of the poetry, but also the life style of Piccolo himself : his deliberate anachronisms, his cultivation of exclusiveness, his self-conscious insistence on forms. All his obituaries officially recognized the impress he gave himself : "the last representative of a certain type of acstheticized baroque Sicilianness" read the *Corriere della Sera* comment.

As his life was recondite, so, often, is his poetry ; not open, as Montale said in his preface, to immediate meaning ; not easy. It is heavy, sometimes, as the very sultriness of Sicily ; and, like his land, superabundant, rich with images, figures, and allusions which are as exciting to the mind in their fluidity as the ceiling of a baroque church or the excesses of rococo fountains. It may have been a certain impatience with the facile categorizing of him as baroque that influenced Piccolo's last collection, *Plumelia*, for though the subject matter is still his Sicily, the form in his new lyrics is much tighter, more concise as he himself carefully points out.

True. But still baroque. The adjective, like the attribute, will, always stick to Lucio Piccolo ; for it is his essence, his heritage, his world, and his art. As the eminent Italian scholar, Glauco Cambon, who has written the foreword to the collection of translations, has noted, poems on inconstancy were common in the baroque age of the seventeenth century, and Piccolo "shares with his ancestors of Gongora's age that supreme concern for the instability of phenomena which makes life a phantasmagoria—an inexhaustible, yet deceptive richness under which nothingness yawns."

The poet himself memorably concludes it all in the ending to "The Sundial" :

But if the fleeting is dismay
forever is terror.

BIBLIOGRAPHY :

Life Comes for the Poet : Paul Horgan, Random House
Singing Birds at Large : Edith Milton, Harper and Row
Lucio Piccolo : His Canti Barocchi : A Madison, Harvard University Press
Lucio Piccolo : The Birth, Death and Re-Life of a Poet : Helen Barolini, Yale University Press

ADULTHOOD

UDAYAN MITRA

Things of note
Are scribbled
On scraps of paper
Or carved
By a distracted tone
On virgin sand
Freshly swept by the sea
And drawn with diligence
On greasy steel plates
With a fat forefinger
After a sumptuous meal.

Memories fade
Viewpoints change
Things of note are forgotten.

And all that remains
Is the drudgery of mechanicality
Of repeating in spite of oneself
Equations hammered into the brain
Reiterating cliches on clean sheets of paper
With an overpowering sense of urgency.

The exhaustion
Kills
And troubles no more
The insensate sleep of obeisance.
While things of note
Songs of innocence
Flow down the gutter
With discarded condom wrappers
And soggy unused toilet paper

Ways Of Seeing

ABHEEK BARMAN

Ancient Evenings :

For the Babylonians and the Egyptians, circa 3000 B. C., the world was an oyster with water underneath and overhead, enclosed like a babe in the womb. Water from overhead seeped through the dome as rain and the lower water rose as springs. The sun, moon and stars danced across the firmament, entering through doors in the East and disappearing through doors in the West. The universe was a great stage where mythological figures played out their lives—or deaths. Sometimes the unforeseen occurred, as during eclipses, and then sanguinary explanations were offered such as that of a giant sow eating up the sun or the moon, or, as in India, the torso-less demon Rahu gobbling up the moon. However, like deaths witnessed in a war film, these events were remote and though causes for concern, did not disturb our ancestors unduly.

The Ionian Greeks—Thales of Miletus, Anaximander and Pythagoras—started a movement to explain the universe along logical lines, devoid of mythological trappings. The fact that their theories fell far short of actual reality may be attributed to two reasons : First, the tools with which to seek this kind of knowledge were totally inadequate in their age, and secondly, there is required for the germination of all fruitful ideas, a fertile intellectual and social climate. In the case of the Ionians, the first cause was the more serious one. Eratosthenes of Alexandria in the third century B.C. proved quite convincingly from logical hypotheses and a few simple experiments that the Earth was a small world with a curved surface and a diameter of approximately 40, 000 kilometres. The fact that Eratosthenes was ignored well after the Copernican revolution is due to the second reason cited above.

The examples serve to illustrate a basic concept and raise a few questions. First, there exists a chasm between reality as perceived, i.e. empirical reality, and reality as understood, i.e. the conceptual aspect of reality. The Babylonians, Egyptians and ancient Greeks excelled in the observational sciences, but like the second face of Janus, turned glassy eyes to the conclusions their observations pointed to. This leads us to a central question : If observed reality differs from conceptual reality (as it has often done), then can one ever form any unified idea of what actual reality or truth is ? Does there, indeed, exist any objective

criterion to apply to reality as we perceive it ? If so, then at what level of objectivity does one draw the line and say 'Yes, it is so' ? And finally, how far can one extend objectivity ?

Mirror Of The World :

The greatest contribution of Kant to the philosophical edifice he erected was the idea of human sensory perception of the world. The mind, according to him, is not a *tabula rasa*—a passive recipient of impressions. The mind is what shapes the individual's understanding of the universe. "It remains completely unknown to us what objects may be by themselves, apart from the receptivity of our senses. We know nothing but our manner of perceiving them ; that manner being peculiar to us, and not shared by every being, though no doubt, by every human being."

This idea of the mind being the mirror of the world shakes the edifice of detached, impersonal objectivity somewhat. Every observation made about the world, every little sensory impression is modified by the individual's own consciousness, tempered and moulded by his personal psyche. However, does our perception of the moon differ from person to person ? It might in certain romantic or personal allusions, but certain facts about it—that it is a spherical, airless, dusty satellite orbiting the Earth, for instance—are taken for granted. Objectivity, not in the strictest abstract sense, but as a consensus of individual impressions, remains valid, despite Kant.

The Falsity Of Truth :

However, this in no way implies that truths once accepted are inviolate. In the process of man's endeavour to understand, many time-honoured 'truths' have collapsed, to be replaced by more satisfactory alternative concepts. This leads us to the very important axiom : Every Truth fails when proved false. Herein also lies the very important distinction between faith and knowledge. Faith denies this axiom. To the faithful, even the illogical and the irrational may be acceptable. One of the prime requisites of faith is a willing suspension of disbelief. Knowledge, on the other hand, survives on the basis of criticism and re-examination of accepted norms. It should be able to adapt itself to suit new evidence, and if not, to yield ground to better-suited ideas. Eratosthenes undertook a rigorous examination of the 'fact' that the Earth was flat and concluded by proving it spherical. The fact that his ideas were considered radical or erroneous is due to the prevalent social environment, which was hardly conducive to such thinking. Russell has a lot to say about this distinction between faith and knowledge.

The Ghost In The Machine :

The medieval anthropocentric view of the cosmos underwent a radical change in the period between 1500 and 1700 A.D. The Copernican revolution which followed the publication of his pathbreaking paper (1543) and the achievement of Kepler and Galileo completely overthrew the medieval ideas. Newton, Laplace and Descartes propounded the mechanistic world-view with great enthusiasm and influenced Western thinking and culture right up to the present century. The Universe was a giant machine with the planets and the stars as tiny cogs within it. The Cosmos was the sum of its parts. The search for these parts, the ultimate building blocks of matter, culminated in the development of atomic physics. And it was here that the great world Machine jammed for the first time. The first apparent contradiction was the dual nature of light : In 1803, Thomas Young had given convincing evidence that light was a wave phenomenon. However. Einstein proved with equally convincing arguments that it was actually particles of quantised energy. The dilemma was solved by taking recourse to the fact that light was both wave and particle. The first of the contradictions was beginning to surface.

Meanwhile, Werner Heisenberg propounded his famous 'uncertainty principle' which said that as we probe deeper into the subatomic realm a certain level is reached beyond which one part or another of reality becomes blurred. In other words, there are limits beyond which we cannot measure accurately, imposed by the very way in which nature presents itself to us. To add to the confusion, the Japanese physicist Hideki Yukawa pointed out that Neutrons and Protons stick together in the nucleus, by virtue of exchanging their very 'personalities'. At every instant the positively charged Proton gives up its charge to a chargeless Neutron thereby becoming a Neutron itself and changing the Neutron to a Proton. This he called an 'exchange force,' but that only aggravated the confusion. The universal world Machine seemed to be destroying itself from within. It was time for a totally new conception of the Universe. This was provided by modern quantum mechanics.

If absolute reductionism, the breaking up of the world into the parts to understand it, fails in the remote world of atomic physics, it also fails at the socio-economic levels. For one thing, there is the fallacy of composition, which occurs when we try to transpose the behaviour pattern of a single individual on to that of a whole community. For example, in a given community with a specific number of jobs, one individual working harder than usual will be able to get a better job. If however, every member of the community works that much harder, they will certainly not all get better jobs. The same reasoning applies to the system of lotteries : A whole group speculates in the hope of becoming the winner, but only one individual actually wins.

ZEN, DUALI[illegible] HOLISM

Now if ab[illegible]ductionism fails bey[illegible]tain limits, should one not examine holism[illegible] [illegible]osite credo, which [illegible] indivisibility of systems' ? Holism finds its log[illegible]tr[illegible]um in Zen Buddhism.

"He who knows does not spea[illegible]
He who speaks does not kn[illegible] a Zen Koan, underlining the apparent incompatibility of words[illegible] Yet the Koans themselves are verbalizations and a very important [illegible] culture. The answer to the paradox lies in the fact that the [illegible] [illegible]heir illogicality, obtuseness and often confounding statements, are a means [illegible] the mind of logic.' They are meant to perplex the mind out of its logica[illegible]de. The purpose of this deliberate triggering to 'non-logic' is to transcend dualism. At the core of dualism are words. Whenever we attempt to describe something formally, we [illegible]raw a line between it and the rest of the world. This is obviously incompatible with Holism, and, according to Zen Buddhists, the prime cause for missing the way. The world is one. All attempts to compartmentalize it by classification are therefore futile.

This however does not account for the 'figure and ground' problem. To distinguish between actual motifs and their backdrop has always been the prime requisite for the arts. For a Zen Buddhist this is objectionably dualistic. The ideal Zen Buddhist would, while surveying the words of a p[illegible]phet on a subway wall, make no distinction between the message and the wall ! The point to note here is that h[illegible]sm taken to its extreme fails to give satisfactory answers to even the most mundane questions. Zen satisfies no one apart from its adherents.

HOW DOES ONE SEE ?

Thus, one is driven to reject both the reductionist and the holistic points of view as absolute ways of seeing. Also, at this stage, one is confronted with a dilemma. Reality, it is said, is non-idealization, the correct, objective way of seeing. Yet at certain critical levels of perception the very nature of reality fades, blurs, becomes indeterminate. Also following fr[illegible]m Kant's idea, the abstract notion of objectivity vanishes at the level of human perception (which is the only level we can expect to operate at). If the mind is the mirror of the world, will it suffice if every person has a different, quite independent World View ? The answer to the question lies in a fusion of ideas.

One needs to redefine Hegel's statement that 'Wha[illegible]ver is rational is real,' whatever is real, is rational." Hegel meant this quite literally and extended it to find rationales for many socio-historical events. This is what needs redefinition. Contrary to what Hegel thought, the world is not sustained by reason. Indeed it operates almost wholly on chanc[illegible]cident. Neither Nature nor History is answerable to Man. However, t[illegible]of the whole thing lies in the fact that most natural, social or h[illegible]nomena may be probed reasonably and generalities or laws inferred [illegible]haviour. Even in our universe of chance the laws of quantum [illegible] good and phenomena once thought to be irrational and unrealistic have now been accepted with a shifting of reference frames. What is reasonable or not depends on two things. First, the amount of data about the object available at the present moment of time and secondly, on the consensus reached after thorough examination of the data or evidence.

Another point to note is that, with the kind of surprises the Universe is likely to spring on man, he should be forever ready for a rapid switch of reference frames and quick and thorough reexaminations of his concepts. Aetiology or determinism—as embodied by Newton's Laws—works quite satisfactorily in our everyday macro level of seeing, but fail quite abruptly at the subatomic level. This should serve to illustrate the fact that two very different kinds of reference frames are required to understand these two kinds of phenomena. It is perhaps futile to look for general theories of seeing 'Absolute Truth' or 'objectivity' is impossible to arrive at, as has been seen, especially in situations involving human variables. A shift of reference frames will not entail a loss of reality. In fact a shift is a necessity when trying to understand different phenomena at different levels of reality. That is exactly what Einstein did when he threw all outdated notions to the wind and proclaimed his special and general theories of Relativity.

Thus, what emerges from this discussion is the fact that for the Universe to be perceived in a grain of sand requires a visionary of the calibre of William Blake. Modern man has to do it the hard way, changing frames of reference, weighing evidence, considering new theories and possibilities. He has only one constant criterion for judgement and that is the consensus of reason : not as an abstract entity but as a method, a rigorous way of looking and an agreement among minds as to what is and what is not. Adapatability of prevalent theories with reference to future shocks is also of critical importance, and the good seer will leave provisions for future adjustment to his own world view.

A Select Bibliography

Barthes, R : Image, Music, Text. Flamingo, 1984.

Bronowski, J : The Ascent of Man, Futura, 1982.
Bronowski, J : The Commonsense of Science, Modern Library.
Capra, F : The Turning Point : Science, Society and the Rising Culture, Flamingo, 1983.
Durant, W : The Story of Philosophy. Simon & Schuster, Pocket Library, 1954.
Hofstadter, D. R : Gödel, Escher, Bach An Eternal Golden Braid. Penguin, 1984.
Kaufmann, W.J. : The Cosmic Frontier of General Relativity. Peregrine, 1979.
Koestler, A. : The Sleepwalkers. Pelican. 1979.
Monod, J. : Chance and Necessity. Fount, 1983.
Russell, B. : A History of Western Philosophy. Simon & Schuster.
Russell, B. : Sceptical Essays, Unwin
Sagan, C. : Cosmos. Futura, 1983.
Watts, A. W. : The way of Zen. Pelican, 1974.
Zukav, G. : The Dancing Wu Li Masters : An Overview of the New Physics, Fontana, 1982.

The Return

Santanu Majumder

I have been to this place before,
Then it had been either a friend or a foe.
But it is not the same place any more.

The barren landscape through the window is rather a bore,
With its shrill insistence on a mirthless 'no'.
Is this, then the same place any more ?
The peevish wind that whimpers but does not at all roar
Waits for its turn to pick up and blow.
It does not seem the same place any more.
The haughty sun starts to sneer at last as before.
But its contempt is only a matter of show.
Can this be the same place any more ?
The childhood hero signals me to open the closed door,
I think he wants me to go.
But is this the same place as before ?
When the nightfall eats away the city's very core,
I would still lie low,
And watch my dreamland turning bare, and barren, and sore.
Although this is not the same place as before.

Convergences

Suhit Kumar Sen

time hates a hiatus,
chasms, corrugations in the air,
and every moment
builds its gilded bridges,
through our blood,
to the communal genesis
of matter, mind unbridled pride—

and we are all entrapped by history,
roots,
a grandparent's rambling story,
we learn at second-hand our private truths.

these convergences make us awkward :

and to compromise,
we burn bridges, to hold the world at bay,
and when infinitely old, infinitely wise,
withdraw around the frozen core, perhaps to dream, to die,
perhaps to pray.

Sartre Marx And The Existential Dilemma

Indraneel Dasgupta

No social formation has ever deserved the judgement implicit in Goethe's remark, "reason madness has become, goodness torment" more than capitalism in its imperialist phase. The illusions of bourgeois liberalism of the last century with regard to a rational, harmoniously developing process of unending progress in history were cruelly shattered by the horrors and disasters of the First World War. Ever since then the emotional ambience of the Western capitalist societies has been dominated by bewilderment, incomprehension, and estrangement. Of all the streams of bourgeois philosophic thought, Existentialism has best been able to portray, and at the same time provide a philosophic rationale for this feeling of "the absurdity of all existence," the "self alienation," the way in which "man sees himself as becoming divorced from his essence to such an extent that he begins to question this essence. Jean Paul Sartre has been one of the pre-eminent paradigms of this school of philosophy, and the most influential philosopher of post-war Eupope.

The fundamental principle of existentialism, as stated in Sartre's book "Existentialism Is Humanism" is the assertion that existence precedes essence, that is, one must begin from subjectivity. Existence itself is the primary phenomenon : I exist, I am an autonomous entity, any thing external is redundant so far as the development of my self is concerned. My present is the reflection of my past : my future is born out of my present. The existing individual stands alone, an island in the midst of a great void ; yet even this subject cannot be known by means of rational cognition.

It follows that society, nation, friendship, are all self-created bonds of humanity, but not its determinants. Social mores including friendship are contingent upon the caprices of the individual. Social relationships ('the other' in existential jargon) are regarded as relations of conflict which draw lone individuals together only to separate them on the question of domination and subservience.

For Sartre, the question of human freedom is central to existence " Man cannot be sometimes a slave and sometimes free ; he is either always and entirely free, or he does not exist at all" (*Being And Nothingness*) True freedom reveals itself in 'frontier situations of anxiety, distress and loneliness. "Distress, loneliness,

responsibilty.. constitute in effect the quality of our consciousness in as much as it is pure and simple freedom" Sartre treats freedom and responsibility as identical. "Man, being condemned to be free, bears on his shoulders the burden of the whole world : he is responsible for the world and for himself as a mode of being". (*Being And Nathingness*). From one entity to another, from one level of existence to the other is my perpetual perambulation. The decisions are mine alone : from genesis and through development, it is the autonomous conscious self that is the sole determinant. Sartre represents the responsibility of classes, groups and individuals as 'responsibility in general', 'the equal responsibility of everyone Secondly Sartre recognises no objective criterion of right or wrong. Hence the existentialist conception of guilt as a universal possibility of human existence. And man turns out to be powerless in the face of this 'human situation'. Sartre quotes Dostoevsky, "If there is no God, everything is possible." When looked at from the rostrum of such basic assumptions, the phenomenon of existence can only give rise to febrile vertiginous 'nausea'.

All these are cogitations of the atomised individual estranged from society at the level of self identification, intellectual and emotional, by the ineluctable logic of late capitalism. The focal point of Marxian philosophy is the aggregate. While Marx propounded the laws of motion of society as an integrated entity, Sartre is engrossed in the reified individual, to the complete rejection of the cumulative. Are not the two entirely antithetical ? Is then Sartre's life long allegiance to the communist movement merely an excrescence on his philosophy, and his radical activism an impulsive choice devoid of any intellectual content, any logic ?

Such a view would appear to be a gross over-simplification. The Marxist views society as an autonomous integrated organism that develops, evolves and moves from one phase to another under the dynamics of its own immanent contradictions. The crisis of suffering is present in society, as is the acute angst of self-contradiction and ruthless self-analysis ; the conflict of opposing forces inches towards its consummation, when it manifests itself in an explosion. Accumulation of quantitative change finally leads to crisis, and ultimately a qualitative change as society discovers a new equilibrium at a completely different, higher level. In this perpetual self purification, there is no involvement of any supra-natural agent. Like the self in Sartre's ontology, the social organism, as envisioned by Marx, is an autonomous, self-determining, self-perpetuating entity.

This correspondence is not irrelevant. From the view-point of logic alone it appears that Sartre, appropriating the Marxian methodology from the macrocosmic

social environs, internalised it in the constricted confines of the microcosm of individual consciousness, fashioning thus his ontology as a direct extrapolation of the dialetical approach. Thus, while its essential dynamics remained the same, consciousness in the existentialist scheme was circumscribed by the boundaries of the individual self, shorn of its socio-political Zeitgeist.

Hence crisis beomes native to the Sartrian universe. Since the social aggregate forms the subject of Marx's scrutiny, hopelessness or helplessness, in both the individual and society as a whole, appears alien to it. The social organism decays, disintegrating as the immanent contradictions ineluctably invade the centre-stage; the existing social structure is ruthlessly dismantled; yet in the course of the same process the social individual ascends to a new level, a higher form of civilisation is born out of debris of the old. The self-purification of society is its innate characteristic, not the momentary fortuitous result of an isolated interplay of forces. And thus, Marx recognises no limit to the human will and capacity for self-transcendence.

The situation alters radically as we approach the universe of existentialism. The individual stands alone with his own Self; his responsibility to himself is to seek self-realisation in the depths of his own being. His Self, it is true, seeks emancipation, transcendence of its own limitations, the unfolding and consummation of all its potentialities. And yet, what is the nature of that consummation for the individual reified only in isolation ? The Self possesses the twin media of body and consciousness. One may develop, refine, hone one's own consciousness, of one's own accord, to a certain extent. And yet, that extent is completely circumscribed in the perspective of the individual's unconditional alienation from everybody else. I have to enter into the depths of another's consciousness, to utilise aspects of that consciousness for the enrichment and consummation of my own.

In the same way, in order to attain self-realisation through the medium of the body, one must seek the experience of physical encounters.

It is precisely at this point that the existentialist's dilemma manifests itself in all its ramifications. Since one is isolated from other selves by the basic dictates of one's own philosophy, it follows that the consciousness of the other is entirely beyond my ability to assimilate. The warmth of Being, too, is decisively absent where the physical experience of intimacy does not incorporate elements of consciousness within itself. The ultimate emancipation of existentialism, passing along the cul-de-sac of self consistency, has no option but to become synonymous with failure, inadeqacy and helplessness. The logic of its innate contradictions turns its pride—the free soul—into its peculiar self-ordained curse of existence.

From the lonely confines of the individual self, one must establish a functional relationship with the collective, if alienation is to be somehow overcome. And thus the individual finds empathy assuming deeper and still deeper shades of commitment : commitment to man, not as a philosophical abstraction, but as a live, tangible, palpitating reality, that assures the exultation of self-emanciapation in complete identification with the multitudes engrossed in the struggle to fashion a new society out of the debris of the old.

Sartre chose the uncomfortable side of the barricade. He walked in the mammoth rallies of Paris, addressed crowds of students, youths and workers at street corners, mobilised public opinion against French, and later American imperialism. The choice was conscious. And for him, imperative as well.

To sum up. The Marxian world-view, though in a very restricted sense, was indeed incorporated by Sartre into the broad matrix of existentialist philosophy. Yet when shorn of its broad socio-historical perspective, dialectics could only aggravate the intrinsic conflicts and contradictions of existentialism. That Sartre joined the Communist party is not really central to existentialism, one way or the other. The point is that he had to make a political choice. And there lies the greatest failure of extentialism :—its inability to resolve the human dilemma, as envisioned by itself, under the preconditions, postulates and assumptions of its own making.

Sand Castles

Saugato Ghosh

The old man winced as the boy gave a sudden kick to the sand castle. The castle crumbled into a shapeless heap with the twigs that had been planted into its keeps lying in the heap helplessly.

"Why did you do that ?" He asked the boy in genuine bewilderment.

The boy looked up sullenly. What's that to you ?" The voice was very deep and clear.

The old man shuffled in embarrassment. "No, but you have been building it for so long. And it was a very nice castle."

"Its no use."

"Why do you say that ?" He edged towards the boy uncertainly.

"I once built a castle far, far better than this one." There was a pause. "But I built it near the water." The boy pointed at the shore where some young men and women were rushing about excitedly and laughing. "A wave came and swept it away. The castles which I have built ever since are not half as good as that one. Whenever I build one, I remember that b-i-g castle I built near the water. I get angry. And I kick it down." He stamped his foot on the sand.

The old man stood silently making crosses on the sand with his stick, searching his brain for some way to continue the conversation. Then he asked, "What is your name ?"

The boy stared at him grimly for a moment and then, turning around suddenly, started to run.

"Hey, wait. Don't go," the old man shouted, but the boy kept running until he was lost in the crowd thronging the beach. Not once did he turn back.

*

The old man found the boy on the beach the next afternoon. He was squatting on the sand near an irecream stall, the sea breeze ruffling his hair, fingering a broken shell absent-mindedly. The old man deliberated over approaching him for a moment and then advanced somewhat diffidently. The boy looked up with his glum face.

Suddenly the boy smiled.

"Has your father gone to find the diamonds too ?"

"What did you say ?" The old man was puzzled by the abrupt query. "I can't hear very well."

The boy remained silent. The old man sat down on the sand by his side and stared at the sea. The sun had set and the fishermen's boats were making a seemingly perilous passage across the dark waves of the ashen sea.

"Do you...would you like an icecream ?

The boy shook his head briefly as he viewed the shell in his hand. Then he spoke in a bemused half-whisper, "I have got the sea in my hands."

"Really ? Well show me your sea." A note of indulgent condescension crept into the old man's voice.

The boy lifted the shell in his hand. "My father once told me that you can hear the sea, if you bring a shell very close to your ears. See if you can. "He handed it over to the old man.

The old man pressed the shell to his ear for a seeond and said, "Yes, I think I can hear it."

"You are a liar !" The answer came quickly. "The sea can't be heard inside a broken shell." There was a pause. "This one is broken. Everything I like gets broken."

They gazed at the sea once again, at the looming clouds on the horizon and the seagulls uttering shrill cries as they circled above the waves. Suddenly the boy turned to him eagerly.

"Do you know where seagulls lay their eggs ?"

It struck the old man that not once in his ten years by the sea had he thought about that. He felt embarrassed all of a sudden to find his ignorance exposed before the boy. "Well, I suppose...they just lay them."

The boy made a sardonic pout. "You are a stupid old man." The old man grew red behind his ears. The boy stood up and started walking away. After a few steps he turned back and said, "Come tomorrow, I'll tell you where the seagulls lay their eggs" Then he walked away.

*

The old man resolved not to play the fool again, "Has my life come to an end that I must while away my time in being the butt of a precocious brat's

jokes ?" He muttered angrily as he returned home that evening. But the next afternoon he was there again, sitting by the boy near the icecream stall.

"When I first came here I asked my father whether the seagulls dropped their eggs in the sea. No, they didn't, my father said, 'cause if they did the waves would sweep the eggs away or the fishes eat them up and there would be no baby seagulls any more. There is a cliff far out in the sea, he said. It is a big cliff, very tall and old. The waves batter against it ceaselessly, yet the rocks don't budge an inch. On the face of the cliff' behind the clouds of spray that swirl in the air around it there are many caves. When the sun sets and the sky grows red the seagulls return to these caves to spend the night. It is in these caves that they lay their eggs." The boy stopped and looked triumphantly at the old man. "But these eggs are not like those of ordinary birds. The eggs are hatched— at night and inside the shell you don't find a baby seagull. You find a diamond— a large shining diamond. All night the diamonds twinkle in the darkness and sailors out in the sea can see them. As day breaks the diamonds become baby seagulls and cry to their mothers for food. As long as they remain in the caves they are diamonds by night and seagulls by day. But once they start flying over the sea and the sun hits their wings and the salt spray touches their eyes and the wind passes through their feathers they can't turn into diamonds any longer So they fly on and on above the waves crying because they have turned into ordinary birds and have to find their own food."

"It is a beautiful story." The old man said "Where is your father, by the way ? You always seen to be alone."

The boy gazed dreamily at the breakers foaming over on the beach. The wind blurred his words, for he was speaking softly, a faint smile playing on his lips, "My father has gone to find where the seagulls lay their eggs. He has bought a boat from the fishermen and is rowing across the sea in search of the cliff that is hidden amid the big waves. He sleeps all day in the boat and rows at night, for you can see the cliff at night when the diamonds in the caves gleam in the darkness. He has probably become very brown and dirty with a long beard and matted hair. But he will find the cliff one day," the voice grew loud all of a sudden," he will find the cliff and climb it and find a newly hatched egg with a diamond nestling inside the shell." The boy paused, with a soft glow of happiness in his eyes. "And he will bring back the diamond to me. I shall keep it in my room. It will be a white, fluffy seagull by day. I shall feed it and pet it. At night it will be a large, dazzling diamond. It will light up the whole room and I won't be afraid to sleep alone any more..." The voice died away.

*

The old man returned home late that night after wandering on the beach

through a maze of darkness interspersed with neon lights, strumming guitars, beach parties and feverish laughter. He felt sorry for the boy whose childhood had come to a halt inside a broken seashell by an icecream stall, spending his lonely hours in weaving a fabric of dreams around the memory of a dead father. Loneliness, a ghost that had assailed him from every corner of his life for the last ten years assumed a form he had never experienced. An old man's isolation was nothing, he realised, before the isolation that hemmed in a young soul bereft of an irreplaceable link in life. His house with its gloomy facade and a gloomier interior—a house he had entered every night with an intense feeling of weariness, seemed an affable companion when he thought of the boy shivering in his bedclothes, in a room peopled by dark shadows. He could not sleep well that night.

*

They walked along the beach in the twilight away from the crowds until they reached the point where the sand gave way to the rocky shore. The boy kept up an incessant monologue, speaking of the city where he lived, especially of his school friends. Not once did he go back to their conversation of the previous afternoon. The old man tried to appear interested but his mind kept harping back on the story the boy had told him, the glimpse he had had of a world more lonely that his. Suddenly, he realised that the boy had stopped speaking. He turned back.

The boy was standing a little behind him. At his feet lay a seagull. It had probably crashed into the telegraph pole towering above them, just behind the boulder-strewn shore. The beady eyes in the white head were staring up unblinkingly and the long wings so graceful in flight were spread in an awkward and twisted position. The old man suddenly felt his blood turn cold. An inexplicable terror clutched at his throat as he looked at the dead bird and the boy standing above it silently. "Come away from it !" "He shouted on a sudden impulse.

"Come away, I say !"

The boy looked up at the old man slowly. Very deliberately he picked up a jagged piece of rock from the ground and hurled it at the old man.

*

"There's a gentleman to see you, sir." The old man blinked in the glare of the sunlight that was streaming into the room. The nurse was standing at the foot of the bed with an expressionless face. The pain had lessened considerably, it was no more than a dull ache at the back of the head. "Who is it ?" He asked.

"No one you would know, sir. That's what he said. He is the father of the boy who hit you with the rock"

"Father of whom ?" The old man sat up in bed slowly.

"The boy who hit you, Sir." The nurse repeated in an even tone. "Shall I ask him to come in ?"

A man entered the room. A neatly dressed man in his mid-thirties, greying at the temples, a worried expression on his face. He approached the bed guiltily The old man motioned him weakly to a chair

"I can't really believe that my son caused this unfortunate injury to you, sir." 'The voice was well-bred and apologetic. 'I know that he is steadily becoming abnormal. It began after his mother's death. But it became really pronounced after my second marriage. He never could get along with my second wife. It was a gross mistake on my part to have brought him along with us here, I suppose. He has made a hell out of our lives back home and my wife was vehemently against his coming with us on our first trip after marriage. And on top of that..." His voice drifted away into an inaudible murmer.

The old man with his queer stare was giving him an uneasy feeling. He hoped to God that he was sounding sufficiently apologetic. "Now, about this, er, regrettable incident, I wondered if I could be of any assistance to you...of course we have decided to have him sent to a reformatory but still, any compensation....."

The old man sunk into his pillow and closed his eyes tiredly. "Go away," he muttered softly, "please go away."

A seagull cawed shrilly as it perched on one of the hospital balconies and then it was gone, soaring up once more in the blinding sunlight.

People See What They Are Prepared To See

Bhanu Singho Ghosh

"How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see"

Dylan

Hunger is not an unavoidable pnenomenon like death and taxes ! We are no longer living in the middle ages. Today's world has all the resources, technical and otherwise, to feed the present population of the 'Spaceship Earth'. Some people wherever they live, always eat first and eat a disproportionate amount and others scarcely do anything to alter the situation unless of course they are specifically told to 'eat cake'.

Hunger is a scandal ! It is interesting to note that the developed nations (whether of the East or the West) consume about half the world's food production while their animals eat about a quarter. In the underdeveloped countries grain is mainly consumed as grain whereas in the industrialized ones it is used to raise cattle : 1 Kg of beef requires more than 30 Kg of grain and 1 Kg. of pork requires more than 16 Kg. of grain.

Instinctively one would like to believe that famines are not man-made disasters. It is far more comfortable for us to believe that famines are due to natural vagaries, an act of God. But the uncomfortable truth is that facts point unerringly to man or, to be precise, some men who also happen to be rich and well-fed. Let us now consider the problem analytically and structurally so as to cut across the smokescreen of popular myth and official cant. A closer scrutiny shows that only the poor—wherever they live—go hungry, and that deeply rooted patterns of injustice and exploitation, homegrown or imported, literally prevent them from feeding themselves. This sort of analysis is not popular with people who may profit from such injustice and as a result so many of us have tried to throw back the problem on the lap of the poor themselves or more specifically on their reproductive organs. It is often asked "Why do they raise children if they can't afford it ?" The answer is not that simple. Another baby for you means visits to the clinics, expensive gynaecologists, expensive diet, prams, disposable nappies followed by an expensive education and a myriad of other outlays and when you finally get your costly progeny on his own feet how much does he contribute to your

income ? On the other hand another baby in a poor family means only another extra mouth to feed— a marginal cost difference. But from 4-5 years of age it will make important contributions to the family. Later the child will take more burden off his or her parents. Moreover, child mortality rate in poor families is very high indeed (about 50%). Once we get to feel this it becomes easy to comprehend that children are an economic necessity rather than, as some holier than thou experts suggest, of lack of restraint or a consequence lack of recreational facilities in the evenings, or perhaps, illiteracy and ignorance of biology. For a poor man anywhere in the THIRD WORLD his children are his only wealth - his only insurance for old age.

Let us now try to see how land distribution, arable land per capita and hunger correlate. I would give only certain figures—and you may draw your own conclusion. China has arable land per capita ratio of 0·13, South Korea has 0·07 and Taiwan has only 0 06. These countries are more or less able to feed themselves. Whereas among large importers of food, Pakisthan has figures of 0·40, Bangladesh has 0·16 and Indonesia 0·15—all greater than that of China. Here is further proof that density of population does not correlate with hunger. Bolivia with 5 inhabitants/square Km and 0·63 hectare of cropland per person suffers from famines while Holland has the figures of 326 and 0 06. As quite a number of Bolivians starve, Holland adequately meets its own demands and also exports food. Thus it is important to realize that hunger and rapid population growth reflect the same malaise--a failure of political and economic systems.

That food is a basic human necessity does not mean its availability has been recognised as a basic human right. For the people who call the shots, it is nothing more than a commodity which also happens to be edible. Psuedo-scarcity is nothing new, neither is it restricted to any particular region. But the astounding fact is the impunity with which multinational agrobusiness corporations with their formal and informal links with different governments, some governments and multilateral agencies work together and share the responsibility of the fate of the millions. This planned scarcity apart from being economically favourable to the developed countries also gives them a political leverage as was emphasized by the Hoover Plan.

Only those fortunate people who can become what the economists call consumers will eat in the Brave New World being shaped by the well fed. That is why often technological solutions are given to this problem of food crisis. But a technical solution ceases to be only technical if the unjust systems are not scrapped. Certain well-meaning philanthropiststs as well as agronomists like Rene

Dumont have put the blame at the individual level but one feels the problem is to be resolved by collective action—which alone can put sufficient pressure to cause the changes. Whether you eat more mutton or rossogollas is a matter of your own choice and a matter between you and your physician. Eating less wont help the poor who cannot afford to buy ! (Don't worry if you cannot buy prawns, they won't rot—they'll be exported to Japan or the US) In fact this argument is in the same intellectual plane as—"Darling ! Think of the millions of children who go to bed hungry ; finish off your milk and this apple too !"

Apart from the so called development programmes like the population control projects or the Green Revolution, certain short term projects are also often envisaged like the Food Aid or the Food for Peace [PL 480]. Whether these are genuine philanthropic gestures or ploys to stay one jump ahead of revolution—these are really no solutions. Firstly they provide only short term relief without trying to remove the root of the problem. Secondly the food often finds its way to places where it is not all that scarce—courtesy of the black market [or if you don't mind—due to the pressures of the free market]. A classic case of this has been the food given as aid to Bangladesh in '74-'75 but which found its way to the Indian markets. So the standard liberal solutions that are offered are what the poor just don't need at all. All that is needed is a social change otherwise known as justice. With that most of the problems could and would be resolved.

It is customary to end this sort of essay with what is generally referred to as 'Seeds of Hope' like 'Health for everyone by 2001 A.D.' I am not against such lofty sentiments and opt for such noble prose whenever I can manage it. But I would rather point out that if you took 10 minutes to read this article, somewhere in this world about 200 people have died of starvation, malnutrition and allied diseases, in that time. Now you know as much as or more than I do ; so let us try to act so that we do no thave to echo these noble [albeit empty] words.

ACKNOWLEDGEMENTS

1. Susan George 2. Rene Dumont 3. U. N. Reports on famines 4. New Internationalist 5. New Society 6. David Owen

Variation On Lara's Theme

Abheek Barman

Despite Heloise, Juliet, Romeo and Abelard
and suchlike tragic lovers—
who satisfied the Muses' hunger
sand lent tragic sublimity to our lives—
shouldn't one be glad for undefined relationships ?

If one ignores well meaning friends
and verbal parlour games,
Snide comments and well-meant advice,
It's quite sublime (and feels rather nice)
To hold hands
and tread grass
wet from early morning rain.

Despite Arnold's human islands
cowering beneath the moral edifice,
To choose (as Zhivago did) to let
events take their course...
To watch the sun rise,
an orange haze in the winter air.
Our mingled breath puffing smoke,
To talk for hours on end
without the usual sentimental platitudes.
Or in the pelting summer rain,
Your laugh cascading in a million droplets...

The Making Of A Myth

Suman Dhar

Huge, thumping feet torture the ground
And the fiery mob clears away

But one man stands tall
With stooping truth.

The massive hands descend,
And the man is felled.

Writhing in agony the legs scatter
As fleeing comrades chant his name.

Then, the flash of silver, the sparkle on a face
And, a myth is made.

Dancing To Tagore

Ananya Chatterjea

The 125th birth anniversary of Rabindranath Tagore is being commemorated with much enthusiasm. Among other things, there have been numerous presentations of Tagore's dance-dramas, as well as of script programmes of Tagore's songs, accompanied by dances. One wonders, however, why so little attention is being given to reviewing the form of Tagorean dancing, as it stands today.

The form of Rabindranritya today is certainly much different from that which originated in Santineketan, under Tagore's guidance, around 1919. At that time, he invited Gurus from Assam, Manipur and South India to teach his students the fundamentals of these various classical styles. Ultimately, the dances performed in his dance. dramas were based on improvisation and a mingling together of these styles. Later, with Tagore being performed all over the country, Rabindranritya has been continuously influenced by other classical and folk styles. Even Western ballet has left some imprint on this form of dance. Tagorean dance has, in short, evolved—and perhaps it would not be wrong to say that it has become much more sophisticated and complex today.

Unfortunately, one often finds a lack, in most dancers, of a conception of the nature of such dancing. Tagore can certainly be regarded as an institution in itself, but while performing, it is imperative to keep in mind that dance, here, is the brightest facet of a complex whole of which the other facets are the lyrics, the tune, the accompanying music. And all these aspects must move in complete unison in order to create a harmonious impression.

If this is so, there is obviously no dance for dance's sake in Rabindranritya. Dance must impart a new dimension to the song, and in Rabindrasangeet is of great beauty and importance. Further, in composing the music for his plays, Tagore had laid particular stress on 'raga-bhava', that is, he set the lyrics to ragas best relating to the mood of the dialogue. He even used folk melodies where the mood of the song demanded it. The stress, that is to say, lies everywhere on the mood of the situation. Rabindranritya, therefore, must first fulfil this condition : it must primarily be expressionistic.

The question now arises : What should be the actual form of such dancing ? Now, dance is, after all, one of man's primary modes of self-expression. In

using this mode he is working through the medium of what is intrinsic to him—his body. His emotion, his moods are moving him to express through his limbs what he is feeling. And he is using not just his arms, fingers, legs and feet, but his entire body, his eyes, his lips. Dance demands that one feels and expresses with one's entire self. And this is true of every form of dance.

However, since Rabindranritya is set to the created medium of words and tunes, it cannot become so prominent in itself as to divert attention from the beauty of the song and revert it completely to itself. Elaborate mudras (hand gestures) and deft footwork in themselves seldom constitute good Rabindranritya. Thus, of the components of Dance as a whole : 'nritta', 'nritya' and 'natya', 'Nritta' or pure dance is almost wholly absent in Rabindranritya. For there is little or no Rabindranritya danced for the aesthetic pleasure of the rhythmic movement of the body. The other two components, 'Nritya' and 'Natya' enter almost wholly into this dance-style. In Nritya, 'ras' or sentiment and 'bhava' or mood are conveyed through facial expressions and appropriate gestures. 'Natya' comprises the purely dramatic element in dance. The object of both 'nritya' and 'natya' is to depict ideas, themes, moods and sentiments by using 'abhinaya'. 'Abhinaya' which literally means 'a carrying to the spectators' involves four techniques, all of which occupy positions of great importance in Rabindranritya. The first teaching is described as 'Angik', meaning gestures of the body. The Natyashastra defines several movements for each part of the body—the head, the eyeballs, the eyelids, the nose, the cheeks, the feet, the fingers, and the posture of the entire body, each suiting a particular mood. The 'vachik' technique comprises the elements of poetry, song and music : apart from the modulations of tune and voice the tempo too must be regulated to harmonize with the particular sentiments and to emphasize different nuances of feeling. Costume, make-up and jewellery must equally suit the character and the mood—these are classed under the 'Aharya' aspect of 'abhinaya'. Finally, these are the physical manifestations of mental and emotional states which are described as the Satvik technique. These include, among others, trembling, change of colour and weeping.

However it is important to remember that Tagorean dance it not classical dance, it is not bound by the limits set by the Natyashastra. Rabindranritya is its own style. If, in Rabindranritya, a dancer wants to impress upon his audience that he finds something very beautiful, one wonders if he will be successful by using the traditional mudra for 'Sundara'—the left hand forming the 'alapadma' mudra and the right hand, the 'suchi' mudra, even if it is accompanied by the appropriate facial expression defined in the natyashastra. I believe Rabindranritya demands that the mood of the song be distilled out of the stance of the body itself—and this is to be enhanced by the facial expression.

A Rabindranritya artiste is free to adapt movements from any culture so long as he finds in them an equivalent of the sentiment evoked by the song. That Tagore himself intended it to be so is obvious from his own directions and the Kathak style of dancing was not to be used in Rabindranritya except, to some extent, in composing dances for the character Uttiya in his dance-drama, 'Shyama.' Further, the dances of the character 'Kotal' in the same dance-drama were to be composed largely in the Kathakali style. The dance style, in other words, must be a natural extension of the character and the emotional tone of the song.

Just as it is unacceptable, in Rabindric dance, to introduce a pure drama movement simply because it agrees with the rhythm of the song, it is equally pointless to try to effect a literal translation of the song, into the medium of dance. It is the shade of feeling which matters— the degree to which a dancer can convey that he has grasped the style. The writer had once seen a production of the dance drama 'Shapmochan' where the song "Tomār ānanda Oi Elo daare, ogo purabashi" had been danced entirely in the style of the Gujarati garba. It was at first rather surprising to the eye, not only because it was something communal, but also because that part of the drama is set in South India. In a way, however, such choreography can be justified because the dance was certainly expressive of the joy and happy revelry which comprise the dominant mood of the song.

Because this form of dance springs from feeling, it becomes a sort of spontaneous self expression, enabling the dancer to project himself into the heart of another person, and to make contact with other souls on the same plane of feeling. This is why Rabindranritya is so personal and yet so universal.

Thus, Tagorean dance must be as an 'objective correlative'—it must be an adequate vehicle of the emotion evoked by the song. The body stance and facial expressions correspond to the form of a poem, the particular mudras to the symbols used, while the steppings enhance the rhythm—all combine to form one unit. Rabindranritya becomes worthwhile when it thus becomes moving poetry in itself and when, together with Tagore's lyrics and tunes, it becomes a pure reaching out to the farthest limits of human feelings.

Class Struggle In A College Canteen

Uddalok Bhattacharya

If, from the liberal view of conflict as being only a functional and stabilising force in society, we switch to a more fundamental notion of it, then careful introspection and even inconvenient emendation of the whole view becomes imperative. Ever since a person is born, he goes through a chain of events or experiences that are cast in different modalities of social behaviour and the individual finds himself oscillating between variegated social formalities that are thrust upon him. The end result is a person attuned by circumstances to a way of life, habituated by thinking to a certain conception of it and dictated by exigencies to a certain style of it.

Students coming to study in the college are drawn from the broad spectrum of convoluted social relations, each one of which has a distinct impression on the students. Ideas that a student carries with him are neither incidental nor variable from person to person. Outward appearances of human beings, as unconditional tools in forming social consciousness, immediately set in motion certain norms of behaviour. Closely knit relations are formed, intimately following these behavioural patterns.

For a moment, consider two groups of persons, all of them sharing the common identity of being students, talking among themselves in a relaxed mood. They are not necessarily hostile to each other. In fact, cases of embittered relations exist only among friends within a group. This is a part of reality that is fragmentary. A student may desert his old company to join a new one. Nevertheless, an uneasy communication exists between the two. But the more fundamental differences between students are verbalized when there is a distinct tendency on the part of one group of students to shy away before a "dominating" system of "values" against which they find theirs to be intransigent or even antithetical.

But conflict does not end here. At a certain plane unity co-exists with it or even transcends it. A student coming from a rich background may not immediately find in college the environment he or she is used to. In that case adjustments with people of a slightly different background are made as long as one can retain one's social outlook and conduct. Allies are, in varying degrees, aware of this necessary collusion. Hence sincere efforts are made to bring these two not entirely

different worlds as close to each other as their resources and ways of behaviour permit. A world within two worlds !

If we now part company with these allied people whose dominant characteristic is a stubborn imperviousness to anything that does not immediately concern them, and join a medley of persons in another part of the canteen, we encounter quite a different treatment of the "realities" represented by the first allied groups of people and a gradual scaling down of the social process. Being part of the praxis and therefore having the whole arrangement impinged on them from within, they distort the praxis by their unreal theories about it. Consequently they set out to formulate a comprehensive view in which modes of thinking and behaviour patterns are pronounced. Anything incompatible with their "system of values" is associated with the "culture" of people with whom they have little communication.

But one should not think that there are no sub-groups, possessing distinct cultural identities, within these two broad divisions. Nor do all members of these two groups remain entirely confined to their own circle. Charges about exclusiveness are answered by asserting that people do make efforts to mix with "different sorts" of people. But this is only an admission that there exist different sorts of people. And even then, mythographers of this "unity" undertake their task on a purely personal level which does nothing to bridge the ever-expanding chasm.

The smug insularity of one group of people and the crass, though not overt, protest that it evokes from another are to be understood both in terms of offensive as well as defensive reactions of students exposed to a set-up that hardly conforms to their immediate background. It is precisely in this context that we can detect simmerings that assume the shape of conflict. But since this conflict is localised in the ideological plane, it is never brought into sharp focus. Hence as long as people do not grow more aware of this divisive tendency and basic dichotomy, they shall make concerted efforts, even if unconscious, towards an escalation of the working problems, making all conditions for the struggle to persist. An assurance of permanence in a world of flux..... ?

Just Another Evening

Atanu Basu

There would be no one to cry at her funeral.

She looked for the cat. It was nowhere. Perhaps it had strayed into the yard. The cat had lived with her for thirteen long years. She felt lonely. The sudden squeak started her out of her reverie. Ralph came back through the door. He cuddled up near her feet, purring.

It seemed like yesterday. They had taken him ; their policies. He never returned. Thirteen long years she had waited. Thirteen winters. Each winter, as she shovelled the snow from the doorsteps, she stared out into the grey horizon, expecting the tall, craggly figure to loom up, as it always did. He never came. The snows came. The image never changed ; only her hands—they were gnarled now.

The crash startled her once again. The wind. The old flower vase had fallen from the mantel. The glass shattered into numerous fragments—like her life. Unaccountable fragments. Who cared ?

Those old eyes stared into the slowly dying fire. There was nothing else left now. A trinket. The gnarled fingers ruffled through Ralph's fur and stopped. A withered leaf was caught there. She fingured it. The cat purred.

It was time for supper. The wind howled. The old boards creaked. She made her way to kitchen. Ralph followed her.

There would be no one to cry at her funeral.

MEMORIES

Udayan Majumdar

Often in dark and still nights, suddenly the purblind avenues of memory-lane get illuminated. Man has a peculiar habit of romanticising the past ; of giving fresh colour and meaning to those obscure patches. Perhaps there is some masochism in the act, 'the agony and the ecstasy' being so satisfying. We feel the present, but in a different way because the question of retrospection does not arise.

Sometimes I wonder that the past takes such a large portion of our present lives. Somehow we have not been able to accept the inevitable progression of time. They are the concrete events and incidents that gave meaning to abstract 'time' but lo and behold, the abstract progressed and obliterated the concrete ! A Frankestein creation, time is.

Often in sleepless nights I have wandered across deserted roads, dimly lighted by tall lamp-posts. The night-breezes have fanned my smouldering thoughts. I have run back to the frothing sea, to the wild eyes and dishevelled hair of my lost mate and I have made faces at my childhood friends. But the wail of those mourning street dogs have always brought me back to the present. Memories are an escape : the fragrant avenues will talk to you, fan you with palm-leaves, but then, will vanish away without premonition.

Future is hope, but uncertain. Still there will be memories then ; pleasant memories to fall back upon in times of adversity. I wonder what incidents the mind shall choose and paint. Perhaps I will see the moon again in the College Square waters, perhaps I will be again in the English Department or perhaps I will be roaming again on silent streets, past midnight.

If we could relive the pleasant moment of our lives, it seems memories would lose their significance. But indeed we would rather have memories. Perhaps it is the very fact that the past cannot be re-lived which makes memories so pleasantly painful. As time marches, our sensibilities change, though imperceptibly. We look back, but from a different angle. We give a new light, a new dimension, as it were, to something that had occurred when we were different. We look back almost as outsiders, yet never quite so.

Sitting by a silvery lake when the tall firs have whispered love to me, I have watched the ripples enlarge and fade out in the distance. And I have gently

turned the kaleidoscope of memory. And I have wished to die—die to block all outside encroachments as it were, and remain immersed in my own pleasures. No real death, this, but oblivion surely. Then suddenly I have seen the mummified Pharaohs float up on the silvery screen—Pharaohs mummified with memory—Pharaohs having no present, no future but only an exhaustible past. I have cried with horror. Life cannot be exchanged for the past ! Memories do not come to the rescue. They are the parasite plants entwined on the branches of life. They are decorative, but no more.

And bitten by frosty winds I have sometimes stared at the lofty snow-clad mountain peaks—grim and indifferent. I have envied them and imitated them. I have refused to look back (or forward either) But when night befell, and the million stars dawned and a star fell, I was with my lost mate and I wept.

Memories are inescapable.

EDITORIAL

"Thus have I had thee as a dream doth flatter,
In sleep, a king ; but waking, no such matter."

The prospect of editing the college Magazine had at first seemed an exciting and flattering one. But it did not take me long to wake up from the dream. I should have been happy if I could refrain from prolonging the age-old editorial wail about the enadequacy of intries, both in number and in quality. But the response seems to be getting poorer every year. After a good deal of prodding, articles began to come trickling in. Even those that were received could roughly be divided into two categories—jejune narratives on the hand, and highly intellectual, speculative discussions of specialised interest on the other. While it is encouraging to find some young minds taken up with problems of science and philosophy, with 'ways of seeing' and 'the existential dilemma', it is at the same time disheartening to note that very few students care to write in a lighter vein. The prevailing assumption seems to be that nothing that does not sound profound is worth being printed. But not everyone is cut out for analytical, introspective speculation on abstract matters ; more often than not, attempts in that direction misfire. A pity, that the rest of us who wax eloquent on sundry subjects in the Coffee House or the canteen sessions, do not find anything worthwhile in ordinary life to write about. The editor was hard put to it to find suitable articles to balance the more serious elements in the magazine, in an attempt to safeguard it from the usual charge of 'high-browism.' There is a good deal in the familiar face of life which we seem to miss. The 'meanest flower' fails to give thougts any deeper than those fit for mere gossip.

I am thankful, however, to those students who did cooperate—all the more so in the context of this general apathy :

"...a hand's breadth of it shines alone
'Mid the blank miles round about."

In this connection I must thank Professors Shireen Maswood, Gouri Shankar Ghatak and Swarajbrata Sen Sarma, without whose affectionate support this magazine would not have seen the light of day.

The lack of enthusiasm regarding the magazine is symptomatic of a growing indifference to matters outside the immediate purview of the syllabus. Theoretically, we are all interested in extra-curricular activities. But "between the idea and the reality," "between the conception and the creation," "falls the Shadow." The College Sports Day has been reduced virtually to a holiday for all but the participants (who are few enough, anyway) ; the seminar activities, in such departments as do have those provisions, proceed at snail's pace ; debates are few and far between ; the attempt to establish a Literary Society a couple of years back proved, inevitably, to be abortive. While for some it is the ultimate aim of examination success which comes in the way, we cannot be sure of the nature of the 'Shadow' in the case of the rest. Perhaps it is a sort of a 'Prufrock syndrome' or an infectious feeling of embarrassment, all the more insurmountable because it has been allowed to grow. The diffidence passes into a habit : 'We have never spoken in public since we entered college. What if we should make fools of ourselves ?' And in the final year, all one has to say is, 'Why venture right at the end and risk my dignity ?' Thus revolves the vicious circle round this stuffy concept of dignity ; nor are we out of it. This tendency is alarming, and must be checked before it gets out of hand. It is up to us to enrich the collective life of the college and save it from being reduced to a round of lectures, lessons and tests.

Some bright features are already noticeable. The Presidency College Chalachchitra Samsad is doing a good job ; it arranged for a Retrospective of the films of Kurosawa in 1986, following upon the Bergman Retrospect the year before. The response has been encouraging. The College Fest, Milieu '87, saw the coming together of students from different departments in constructive work. One of the most heartening events of the New Year has been the stimulating Exhibition Debate organized for the Founders' Day of the College. Events such as these arouse hope. One can only wish they will not turn out to be occasional spurts of enthusiasm in a general drama of inertia.

* * *

"Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past"

We have dwelt long on the shadows in the scene. This is not to suggest that there is no sunshine. While we do not claim to be perfect, we will not repeat the catchwords with men who harp on the 'declining standards' of the institution. Presidency College is no Eden ; but neither is it a den of politicians and drug-

addicts, steadily sinking into academic mediocrity. For all that is taken, much still abides. For all the apathy and the bureaucratic bungling, for all the broken windows and cobwebby corners, for all the water-soiled books and mutilated catalogues in the library, Presidency retains its character. Life within its august portals is still exhilarating, with stimulating lectures, exciting tutorial sessions, exchanges over the morning cups of tea warming gradually into heated debates in the canteen and the classroom, followed by a quiet hour in the sacramental dim light of the library. All these constitute a familiar flavour, but we cannot have too much of it. One's day swings between these—ends and beginnings, pensive reflections and sudden bursts of action, a pulling-up from a tutor and the joy of a new discovery while book-hunting in the library. Presidency, for all of us, is a way of life too varied, too complex in texture, to be bound in by labels or definitions—ranging from 'centre of excellence' to 'centre of decadence.' This editorial is neither a complaint nor an inspired defence. It is a presentation of facts and feelings, for what they are worth.

We are now blasé, third-year and dated, and it feels nice to see the freshly scrubbed faces swimming into our ken. The new batches coming in, however, seem somewhat different from what we were ; they are more self-sufficient, more confident. We rather miss—irrationally, I am sure—the nervous, timid, unsure teenagars that we were when we entered college, pacing our way overawed to the staff room or tentatively towards the canteen. But of course, the old order will change—and the future will be as varied as the past. And the general 'Presidency rhythm' is so compelling and irresistible that sooner or later, all but the most impervious will find themselves caught up in it. By the time the present newcomers leave college, their feelings will surely be much the same as ours are today.

It is a rather disturbing feature, however, that many students these days are leaving college much earlier than they must. The current trend of going abroad in droves has come to have a rather unfortunate consequence : if the college is reduced to a *pied a terre*, how can one expect involvement or commitment ? An element of instability has thus crept into college life. The phenomenon of brain-drain, of course, is to be traced largely to certain flaws inherent in the education system itself, or rather its mode of operation. The general lack of library and laboratory facilities in our country, the trauma of indefinitely delayed examinations and equally uncertain publication of results, the harassment of rushing from counter to counter for simple information, and the dismal working conditions are enough to frustrate and demoralize young minds. This is a general malaise which has tainted our college as well. We are fortunate to be better off

than many institutions in some of our resources—our library, for instance, is one of the best in the country ; but the maintenance still leaves much to be desired. The departmental libraries, again, are desperately short of funds. It is time we thought of experimenting with hitherto untried methods—running the libraries on an entirely co-operative basis, to start with, and not banking on grants and funds at all.

We have been left a rich and noble heritage. But tradition becomes a dead thing unless it is built upon. The infra-structure must be strengthened, the cracks in the walls must be sealed, before Presidency College can stand its ground firmly to prove the "excellence" which so many people grudge it. The threats are manifold. A recurring menace has been the attempt to do away with the Admission Test. Such a decision could be a sure step towards decline, given the inadequate and erratic assessment of school leaving exams, or the lack of parity in the standards of correction under different boards. I am not competent to comment on the socio-political implications of such a step. But common sense dictates that if something is near ideal, it is sane to preserve it and work on its betterment rather than bring it down to the level of things more imperfect for the sake of a dubious equality. It is safer to make the worse aspire towards the better than 'by destruction dwell in doubtful joy.' Presidency deserves the status it enjoys in the public mind. And more.

Subha Mukherji

'युग-प्रवर्त्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र'

कमलेश कुमार पाण्डेय
हिन्दी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष

हिन्दी-साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भ में रीतिकाल के पश्चात् आधुनिक काल का समारम्भ होता है। जिस प्रकार भारत के आधुनिक राष्ट्रीय जागरण का सूत्रपात्र सन् १८५७ के स्वातंत्र्य-संग्राम से स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार आधुनिक हिन्दी-साहित्य में नवीन मूल्य-चेतना का विकास भी पुनर्जागरण के ही समानान्तर निर्धारित किया जाता है। वस्तुतः भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता और मूल्यों की रक्षा तथा उत्थान के लिए जनक्रान्ति का प्रथम प्रयास इसी काल में किया गया और क्रान्ति की यह ज्वाला तब तक प्रज्ज्वलित रही जब तक देश स्वाधीन नहीं हो गया। इसी समय भारतीय जन-समाज में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि दृष्टियों से समस्त क्षेत्रों में नव-जागरण का संचार करने वाली विविध संस्थाओं का उद्भव भी हुआ, जिससे जन-समाज की अन्तर्वृत्तियों को प्रेरित करने वाला साहित्य-बोध भी जाग्रत हो उठा। अस्तुः साहित्यिक दृष्टि से यह काल रीतिकालीन हासोन्मुख शृंगारी प्रवृत्तियों के अवसान एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की चेतना से संचलित आधुनिक प्रवृत्तियों के नवोदय का काल है। इस संक्रमण और प्रवृर्त्तन का प्रमुख श्रेय उक्त जन-क्रान्ति के सात वर्ष पूर्व अर्थात् सन् १८५० में अवतरित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को ही जाता है। निश्चय ही भारतेन्दु जैसे सजग चिन्तक और बहुमुखी कलाकार की रचनाओं में सन् १८५७ के घटनाक्रम की प्रतिक्रिया अभिव्यंजित नहीं हुई, क्योंकि अल्प वय में उनके बाल-चित्त पर ऐसी राष्ट्रीय क्रान्ति का केवल अवचेतन प्रभाव ही पड़ा होगा, तथापि भारतेन्दु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के निर्माण में तत्कालीन घटनाओं की अप्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष प्रेरणाएँ अवश्य रही हैं, जिनकी रचनात्मक प्रखरता से आधुनिक काल का सुदृढ़ धरातल विनिर्मित हुआ, तथा उनके नेतृत्व में ही आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण का नियोजन भी हुआ। यही कारण है कि साहित्य के इतिहास में उन्हें युग प्रवर्त्तक साहित्यकार माना जाता है।

यद्यपि साहित्येतिहास के काल-विभाजन की दृष्टि से आधुनिक काल का समारम्भ सन् १८४३ से माना जाता है, जो २५ वर्षों की अवधि पर्यन्त अर्थात् सन् १८६८ तक प्राचीन प्रवृत्तियों से ही अधिक आक्रान्त रहा, किन्तु सन् १८६८ से लेकर सन् १८८५ तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का व्यक्तित्व समग्र हिन्दी-साहित्य पर छाया रहा। अतएव भारतेन्दु-मण्डली के प्रभाव-क्षेत्र में सन् १८६३ तक 'भारतेन्दु-युग' की सीमा निर्धारित की गई।

इस अवधि में अपने कृतित्व के द्वारा उन्होंने न केवल हिन्दी-साहित्य का पथ-निर्देशन किया, बल्कि साथ ही साथ गद्य साहित्य की प्रायः सभी प्रचलित विधाओं का नव-प्रवर्त्तन किया। इसी कारण आधुनिक साहित्य के उत्तर प्रारंभिक पच्चीस- तीस वर्षों के काल-खण्ड को सभी इतिहासकार 'भारतेन्दु-युग' कहते हैं। प्रस्तुत युग में समाज, धर्म और राजनीति के क्षेत्रों में जितने प्रकार के आन्दोलन चले, सभी

के सूक्ष्म प्रभावों को उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ग्रहण किया, तथा भक्ति एवं शृंगार की परम्पराओं की सैद्धान्तिक पवित्रता एवं कलात्मक सौष्ठव दोनों की संतुलित ढंग से रक्षा की। युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतेन्दुजी ने वैयक्तिक-आन्तरिक करुणा को तो उभारा ही, सामाजिक- धार्मिक सहिष्णुता को भी उजागर किया, साथ ही साथ अन्ध- रूढ़ियों का विरोध और उचित नव-मूल्यों का आग्रह भी किया साहित्य को, विशेषतः कविता को शृंगार की अश्लीलता के दलदल से निकालकर जीवन के व्यावहारिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया।

भारतेन्दुजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रभाव से जिस परवर्तीकालीन साहित्यिक नवयुग का उदय हुआ वह भी पूर्णतया उन्हीं की चेतनाओं के अनुरूप था। साहित्य में सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों का सीधा प्रवेश भारतेन्दुजी के प्रयत्नों से उन्हीं के युग में पहली बार हो सका। तत्कालीन युग की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति सभी युगीन साहित्यकार भारतेन्दुजी की सत्प्रेरणाओं से ही सजग हो सके। उक्त काल में राष्ट्र-प्रेम प्रभु भक्ति, वीरता, शृंगार आदि की चेतनाओं का विकास मानवीय सन्दर्भों में हुआ, तथा भारतेन्दुजी के प्रयत्नों से ही उन्मुक्त मनो-विनोद, हास्य-व्यंग्य, कूटोक्ति वक्रोक्ति आदि से संवलित पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई।

ऐसे युग-प्रवर्त्तक व्यक्तित्व- सम्पन्न साहित्यकार भारतेन्दुजी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित एवं समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। पिता गोपालचन्द भी अपने युग के एक प्रतिष्ठित कवि और नाटककार थे, जो कृष्णभक्त थे यथा 'गिरधरदास' उपनाम से काव्य-रचना किया करते थे, इससे स्पष्ट है कि भारतेन्दुजी को अपने घर में कृष्ण-भक्ति और साहित्यिक सरसता का समृद्ध वातावरण प्राप्त हुआ था। शैशव के सुकुमार क्षणों में ही इनकी काव्य- प्रतिभा प्रस्फुटित होने लगी थी, और पाँच वर्ष की उम्र में ही निम्न दोहा रचकर उन्होंने सभी को विस्मित कर दिया था—

लै व्योढ़ा ठाढ़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान।
बानासुर की सैन्य को, हनन लगे बलवान॥

अकस्मात नौ वर्ष की अवस्था में ही पिता के स्वर्गवासी होने के कारण घर गृहस्थी का सारा बोझ इन्हीं के कन्धों पर आ पड़ा। यद्यपि वे लाखों रुपये की पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हुए, परन्तु ऐसी मान्यता है कि उन्होंने उदार एवं रसिक स्वभाव के कारण अपनी सारी सम्पत्ति हिन्दी-भाषा और साहित्य की समृद्धि में ही स्वाहा कर दी। १४-१५ वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी की यात्रा करते समय ये बँगला भाषा के नाटक, रंगमंच तथा अन्य प्रकार की साहित्य विद्याओं से परिचित तथा प्रभावित हुए। हिन्दी में कविता और नाटकों के अतिरिक्त निबन्ध और समालोचना साहित्य के प्रारम्भ और विकास में भी इनका अभूतपूर्व योगदान माना जाता है, तथा कहानी और उपन्यास का प्रवर्त्तन भी मौलिक रूप से इन्होंने ही किया।

कवि के रूप में भारतेन्दुजी की कविता में भक्ति, शृंगार, राष्ट्रीयता और प्रकृति-प्रेम आदि चार विषय ही प्रमुख रूप से उपलब्ध होते हैं। भक्त के रूप में भारतेन्दुजी ने बल्लभाचार्य के पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षा ले रखी थी। इनके पदों पर सूरदास का प्रभाव स्पष्ट दिखायी पड़ता है। उदाहरणार्थ—

ऊधौ जौ अनेक मन होते।
तौ इक श्यामसुन्दर को देते, इक लै जोग सँजोते॥

भक्ति के अतिरिक्त भारतेन्दुजी की शृंगारिक प्रवृत्तियाँ भी अत्यधिक प्रभावोत्पादक एवं महत्वपूर्ण हैं। वियोग,शृंगार का यह उपालम्भ-भाव कितना मार्मिक एवं व्यजक है—

आजु लौं जौ न मिले, तो कहा, हम तो तुम्हरे सब भाँति कहावै।
मेरो उराहनो है कछु नाहिं, सबै फल आपुने भाग को पावै॥
जो हरिचंद' भई सो भई, अब प्रान चले चहैं, तासौं सुनावै।
प्यारे जू है जग की यह रीति, बिदा की समै सब कंठ लगावै॥

भक्ति और शृंगार के अतिरिक्त रष्ट्रीय-सामाजिक चेतना भारतेन्दुजी की कविता का तीसरा प्रमुख विषय है पतनोन्मुखी सामाजिक परिस्थितियाँ आर्थिक दुरवस्थाएँ राजनीतिक दासता और धार्मिक विकृतियों के प्रति मार्मिक उक्तियाँ इनकी कविता में सर्वत्र देखने को मिलती हैं। इनके नाटकों के गीत प्रायः इसी प्रकार के हैं—

आवहुँ सब मिलि कै रोवहुँ भारत-भाई।
हा। हा। भारत दुर्दशा अब देखि न जाई॥

भारतेन्दुजी की प्रकृति-चित्रण संबंधी कविताएँ नव्य-दिशाओं की बोधक हैं। जल में प्रतिबिम्बित-चन्द्रमा का यह प्राकृतिक वर्णन कितना आकर्षक एवं स्वाभाविक बन पड़ा है—

परत चन्द्र-प्रतिबिम्ब कहूं जल मधि चमकायो।
लोल लहर लहि नचत कबहुं सोई मन भायो॥
मनु-हरि-दरसन हेतु चन्द जल बसत सुहायो।
कै तरंग कट मुकुट लिये सोभित छवि छायो॥

नाटककार के रूप में भारतेन्दुजी का व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रखरता के साथ अभिव्यंजित हुआ है। उन्होंने मौलिक एवं अनूदित दोनों प्रकार के नाटक रचे। 'चन्द्रावली', 'दुर्दशा', 'नील देवी', 'अंधेर नगरी', आदि इनके प्रमुख मौलिक नाटक है, तथा इन्होंने जिन नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किये. उनमें 'मुद्रा राक्षस', 'विद्या सुन्दर', 'सत्य हरिश्चन्द्र' 'भारत जननी' आदि प्रमुख हैं। भारतेन्दु का उल्लेखनीय अवदान हिन्दी रंगमंच का नव संगठन भी है। विशेषतः बंगला और मराठी नाटकों की अभिनेयता तथा रंगमंचयिता से प्रभावित होकर उन्होंने काशी के क्षेत्रों में एक नाट्यान्दोलन ही खड़ा कर दिया था, जिसमें कई भूमिकाएँ उन्होंने स्वयं निभायी थीं। वस्तुतः एक सर्जनात्मक नाट्यकार के लिए प्रायोगिक अभिनेता होना कितना अनिवार्य है—इसका प्रामाणिक उदाहरण उन्होंने स्वयमेव प्रस्तुत किया था। यही कारण है कि उनके प्रायः सभी नाटक रंगमंच और अभिनय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

जहाँ तक नाट्य कला का प्रश्न है, भारतेन्दु को भारतीय नाट्य-शास्त्र के साथ-साथ पाश्चात्य नाट्य—सिद्धान्तों से प्रभावित बताया जाता है। निश्चय ही उन्होंने अपने नाटकों में यूरोपीय दुखान्त

नाट्य शैली का समावेश किया है, किन्तु भारतीय नाट्य—परम्परा का विकास भी उनके शास्त्रीय प्रयोगों के माध्यम से ही हुआ। उन्होंने तत्कालीन पारसी नौटंकी के बँधे अभिनय और ग्रामीण 'यात्रा' नाटकों के खुले मंच के शिल्प—कौशल के प्रभावी तत्वों को लेकर हिन्दी के स्वायत्त रंगमंच की मौलिक पद्धति की प्रयोजना की, जो हिन्दी-नाटकों के इतिहास में उनका अभूतपूर्व प्रदेय है।

नाटक और नाट्यकला के महत्व को प्रतिष्ठापित करने के लिए भारतेन्दुजी ने 'नाटक' शीर्षक एक लम्बा आलोचनात्मक निबन्ध लिखकर आलोचना-विद्या की प्रतिष्ठापना भी की थी। इसी प्रकार उन्होंने 'कवि-वचन-सुधा' और 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' पत्र प्रकाशित करके हिन्दी-पत्रकारिता का प्रतिमान भी स्थापित किया।

सामयिक के रूप में भाषा के सम्बन्ध में भारतेन्दुजी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट था, जबकि तत्कालीन विद्वानों के बीच हिन्दी-उर्दू के सम्बन्ध में एक विवाद ही खड़ा हो गया था उन्होंने ब्रिटिश सरकार की भाषा नीति के विरोध में अपना स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किया, जिसकी प्रासंगिकता सम्प्रति पर्यन्त स्वतः सिद्ध है—

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा-ज्ञान के मिटै न हिय को शूल॥

उन्होंने हिन्दी भाषा के क्षेत्र में दो प्रकार के मानदण्ड स्थापित किये हैं एक ओर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग, दूसरी ओर एकदम बोलचाल की भाषा का। इस दृष्टि से उनका उद्देश्य विचारों को सभी के लिए सुलभ एवं बोधगम्य बनाना ही प्रतीत होता है। अतः भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने सभी प्रकार के आग्रहों से मुक्त उदार दृष्टिकोण ही अपनाये रखा।

अन्ततः हम कह सकते हैं कि जिस युग में भारतेन्दुजी का उदय हुआ था, यह सभी दृष्टियों से संक्रमण काल था। उस काल में भी भारतेन्दुजी ने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह जिस सजग साहसिकता के साथ किया वह उनके 'युग-प्रवर्त्तक व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप ही था। उन्होंने हिन्दी के विधात्मक साहित्य की इतनी सुदृढ़ नींव रख दी कि उस पर कालान्तर में एक व्यापक एवं विशाल साहित्य-भवन का निर्माण हो सका और आज भी उसका विकास मंजिल होता ही जा रहा है। भारतेन्दुजी वास्तव में हिन्दी-साहित्य की नींव के सुदृढ़ पत्थर एवं आधार स्तम्भ हैं और इसी के कारण वे चिर-अमर हैं—यही उनके 'पुष्य-मृत्यु-तिथि-वर्ष' के प्रति ऐतिहासिक श्रद्धांजलि है।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

अशोक त्रिपाठी
तृतीय वर्ष हिन्दी 'प्रतिष्ठा'

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'आधुनिक काल का प्रारम्भ वि० सं० १९०० से मानकर वि० सं० १९२५ तक के हिन्दी-काव्य को पुरानी धारा के रूप में स्वीकार किया है और नयी धारा के अन्तर्गत प्रायः पच्चीस वर्षों के सामयिक परिवर्तनों के अन्तराल को आख्यायित करते हुए उसे मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया है—

१. प्रथम उत्थान—वि० सं०-१९२५-१९५० (भारतेन्दु युग)

२. द्वितीय उत्थान—वि० सं०-१९५०-१९७५ (द्विवेदी युग)

३. तृतीय उत्थान—वि० सं० १९७५ (छायावाद युग)

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त प्रथम उत्थान की विकास-परम्परा ही में द्वितीय उत्थान के 'प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में परिगणित किये जाते हैं। जिनका रचना-काल तृतीय उत्थान ही नहीं चतुर्थ उत्थान तक प्रसारित है। सर्व विदित है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण तथा निर्देशन में ही गुप्त जी ने काव्य सृजन प्रारम्भ किया था, अतएव उनका चिन्तन-बोध भी आचार्य द्विवेदी के विचारों से अनुप्राणित रहा। आचार्य द्विवेदी द्वारा सम्पादित 'सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिन्दी-साहित्य की आधुनिक परम्परा के सूत्र-पात के परिणामस्वरूप तत्कालीन उपलब्धियों के रूप में कम से कम तीन बातों को अनिवार्यतः रेखांकित किया जा सकता है।

(i) ऐतिहासिक पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीयतावादी आन्दोलन का सम्प्रसारण।

(ii) वैज्ञानिक युग के अनुरूप सामाजिक प्रगति का नियन्त्रण तथा नैतिक मूल्यों के महत्व की स्थापना।

(iii) खड़ी बोली के व्याकरणिक तथा साहित्यिक स्वरूप का निर्धारण और गद्य-शैली के अतिरिक्त पद्य-शैली में भी प्रयोग।

वस्तुतः गुप्त जी ने आचार्य द्विवेदी के संरक्षण में जो काव्य साधना की, उसमें युगीन चेतना को व्यापक अभिव्यक्ति मिली, हिन्दी भाषा को मानक स्तर मिला, और मिला परवर्त्ती साहित्य को भव्यतम आदर्श।

ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में गुप्त जी का काव्य-काल भारत की सांस्कृतिक, समाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की आपत्कालीन संक्रमणावस्था का समय था। भारत यूरोपीय औपनिवेशिक राजसत्ता के अन्तर्गत पराधीन था और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के प्रतिरोध के उपरांत महात्मा गाँधी का प्रवेश भारतीय राजनीतिक में हो चुका था। अतएव सम्पूर्ण देश राष्ट्रीय आन्दोलन, समाजिक सुधार और परिवर्तन की क्रान्ति से था।

उसी समय मध्य प्रदेश के चिरगाँव (झाँसी) में १९८६ ई० में गुप्त जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण दास था, जो एक सम्पन्न वैश्य थे। वे व्यापार के अतिरिक्त 'सीताराम' की भक्ति में ही अधिक कीन रहा करते थे। उनके व्यसनों में काव्य-रचना उन्हें सर्वाधिक प्रिय था। मैथिली शरण जी पर ऐसे संस्कारों का वैसा ही प्रभाव पड़ा। पिता की भाँति गुप्त जी भी बाल्यावस्था से ही छन्द रचना किया करते थे। अतः गुप्त जी के छन्दों को देखकर उनके पिता ने एक बार उन्हें आशीर्वाद दिया था—"तू आगे चलकर हम से हजार गुनी अच्छी कविता करेगा।"

भारतीय संस्कृति के आख्याता :

श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' ने संस्कृति के चार अध्याय में लिखा है कि "असल में, संस्कृति जिन्दगी का एक तरीका है और वह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज की छाया में रहता है, जिसमें हम जन्म लेते हैं।"

इस दृष्टि से गुप्त जी की संस्कृति-सम्बन्धी अवधारणाओं पर विचार करने पर यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि वे भारतीय संस्कृति के प्रबल पोषक थे जो मूलतः आर्य सभ्यता तथा हिन्दू धर्म से उत्प्रेरित था। इसका मुख्य कारण यह है कि गुप्त जी के व्यक्तित्व का निर्माण हिन्दुत्व के वातावरण में हुआ था। उनके माता-पिता भाई सभी लोग हिन्दू संस्कृति के संपोषक थे, किन्तु उनमें संकीर्णता या कट्टरता नहीं थी। अतः गुप्त जी का सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी सम्प्रदायिक और पूर्वाग्रही दृष्टिगत नहीं होता। उनमें पर्याप्त उदारता और विशालता हैं। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अनुरूप वर्णाश्रम व्यवस्था दाम्पत्य जीवन और संयुक्त परिवार को भारतीह सभ्यता का उत्कृष्ट प्रदेय तथा सर्वोत्तम उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया वैयक्तिक साधना के रूप में अहिंसा को सद्धर्म और सामूहिक परियोजना की दृष्टि से हिंसा को भी आपद्धर्म का आदर्श निरूपित किया। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि गुप्त जी ने सांस्कृतिक चिन्तन में धार्मिक तत्वों को विशेष मान्यता प्रदान की। गुप्त जी का धार्मिक विश्वास भी सदाचरण और नैतिकता के तत्वों से ही निर्मित हुआ था, जो मानव संस्कृति का सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक प्रतिमान है। उनके सांस्कृतिक विचार जीवन बोध और कर्म संहिता मूलतः कालिदास और तुलसी दास से ही प्रभावित हैं, किन्तु डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी मौलिक स्थापनाओं को भी रेखांकित करते हैं—"गुप्त जी ठीक वही नहीं है, जो कालिदास या तुलसीदास थे।" यह एक मौलिक दृष्टि ही है कि गुप्त जी ने इस्लाम और इसाई धार्मिक विश्वासों को भी मूलतः तथा तत्वतः हिन्दुत्व के आदर्शों से ही प्रभावित तथा प्रादुर्भूत बताया है, और बौद्ध, जैन, सिक्ख आदि मतवादों को हिन्दू धर्म की विविध सरणियों की विकास परम्परा। इसी सन्दर्भ में उन्होंने आर्य जाति का मूल स्थान भारवर्ष में ही बताया है जिसके आनुवंशिक उत्सरण से ही विश्व समुदाय का जातीय-विभाजन हुआ। उनकी दृष्टि में देव-सभ्यता ही मानव जाति का मूल उद्गम है, जिससे आर्य संस्कृति में आस्तिक दर्शन और ब्रह्म ज्ञान का तत्व चिन्तन बिकसित हुआ।

वैष्णव-भक्ति के नव उद्गाता :

मैथिली शरणण गुप्त आधुनिक युग के सर्वमान्य वैष्णव कवि के रूप में भी सम्मानित रहे, किन्तु उनकी भक्ति चेतना मध्यकालीन मनो भाव का परिचायक नहीं। उन्होंने अपनी रचनाओं में राम और कृष्ण से सम्बन्धित आख्यानों को ही काव्य प्रेरणा और काव्य चिन्तन का आधार बनाया है, जिनमें युग

जीवन की समस्या का समाधान भी खोजा है। रामकथा का आधार लेकर उन्होंने प्रमुखतः साकेत तथा 'पंचवटी' की तथा कृष्ण चरित का आधार लेकर 'द्वापर' और 'जयभारत' की रचना की है। यदि ग्रंथ संख्या के आधार पर देखा जाय तो उनकी अधिकांश रचनाएं कृष्ण गाथात्मक ही हैं, जो महाभारत के विशाल फलक पर विनिर्मित है, किन्तु राम-गाथात्मक काव्य ग्रन्थों में ही उनकी आत्मानुभूति का साक्षात्कार होता है, निश्चय ही गुप्त जी वैष्णव सन्त नहीं गृहस्थ-भक्त थे, जिन्होंने अन्ततः रामानुज सम्प्रदाय की राम भक्ति को ही अध्यात्मिक उपजीव्य बनाया था। अस्तुः आदि कवि बाल्मीकि ने रामचरित को 'अनुष्टुप छन्द में बाँध कर अपनी कृति अमर कर दी, मध्य युग में गोस्वामी तुलसी ने रामचरित को भाषा में रचकर यशोपाजन किया, उसी प्रकार आधुनिक युग में गुप्त जी ने फी खड़ी बोली में साकेत की रचना कर पांक्तेय सम्मान अर्जित किया।

तथापि बाल्मीकि, तुलसी और गुप्त जी के 'राम' में अन्तर है। आदिकवि ने राम को एक महापुरुष के रूप में स्वीकार किया है, जबकि गोस्वामी जी उन्हें ब्रह्म मानते हैं, किन्तु गुप्त जी का वैष्णव हृदय राम में ईश्वरत्व तो देखता है पर उनका कवि-मानस राम को एक आदर्श मानव के रूप में भी चित्रित करता। ऐसी स्थिति में वे राम के मानव चरित्र के प्रति रहस्य जिज्ञासा से घिर जाते हैं और अन्ततः 'साकेत' में कह देते हैं—

"राम तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ?
विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या ?
तब मैंगिरीश्वर हूँ, ईश्वर मुझे क्षमा करे।
तुम मन में नहीं, तो मन तुममे रमा करे।"

वास्तव में गुप्त जी के राम न तो ईश्वर के अवतार ही हो पाये हैं और न आदर्श पुरुष ही बन पाए हैं। वे कर्मशील सौजन्यपूर्ण मानव हैं, जिनके गुणों के अंदर ईश्वरत्व आरोपित किया गया है "

(डॉ० विनयमोहन शर्मा)

राष्ट्रीयतावादी कवि के रूप में :

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र के तीन तत्वों का उल्लेख किया है—भूमि जन और संस्कृति, जिनके अनुरूप भारत के राष्ट्रीय स्वरूप की परिकल्पना वैदिक वङ्मय से लेकर आधुनिक साहित्य तक विविध आयामों में विकसित हुई है, किन्तु सम्प्रति पर्यन्त मूल दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है, जिसके परिणामस्वरूप 'अखण्ड भारत' या 'वृहत्तर भारत' का दिग्दर्शन गुप्त जी के काव्य में समग्र रूपेण हो जाता है। इसी राष्ट्रीयता के कारण महात्मा गाँधी ने उन्हें 'राष्ट्र कवि' की उपाधि से विभूषित किया। गुप्त जी की "भारत-भारती" आधुनिक हिन्दी काव्य में "राष्ट्रीय चेतना" की पहली पुकार मानी गई है, जिसमें गुप्त जी ने भारत भूमि की महत्ता का प्रतिपादन, भारतीय पूर्वजों का गौरवगान, तथा भारतीय संस्कृति के उदात्त वर्चस्व का पुनराख्या किया है ?

भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ

सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ?
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन ? भारतवर्ष है।

वस्तुतः गुप्त जी की राष्ट्रीय भावनाओं को दो कोटियों में विभाजित कर परखा जा सकता है—शाश्वत राष्ट्रीय चेतना और सामयिक राष्ट्रीय समस्या। उन्होंने भारतीय जीवन में मानवीय मूल्यों के शाश्वत तत्वों को राष्ट्रीय चेतना का चिन्तन स्वरूप माना और युगीन परिस्थिति में समाजिक संकटों को सामयिक समस्या या आकस्मिक घटना, जिनके निमित्त उन्होंने संतुलित दृष्टिकोण का ही परिचय दिया है। उन्होंने अपने विचार आचार दोनों ही स्तरों पर राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान बनाए रखी। यही कारण है कि कहीं उनकी राष्ट्रीय भावना पर हिन्दूवाद का आरोप किया जाता, कहीं सम्प्रदायिक मतवाद का, तथापि गुप्त जी ने तो वैचारिक स्तर पर "समन्वयवादी अवधारण" को स्वीकार किया है और व्यवहारिक दृष्टि से "स्वदेशी आन्दोलन' का, जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा एक ओर शाश्वत राष्ट्रीयता के सांस्कृति पुनरूत्थान का उन्मुक्त आह्वान किया गया है, तो दूसरी तरफ उनमें सामयिक राष्ट्रीयता के राजनीतिकक नवोन्मेष के लिए स्वतन्त्रय संग्राम के सक्रिय संसक्ति भी दिखाई पड़ती है। अस्तु गुप्त जी ने स्वाधीनता आन्दोलन में सत्याग्रही कार्यकर्त्ता के रूप में जेल यात्रा की, तो राष्ट्रीय संस्कृति के महान आख्याता के रूप में पौराणिक और ऐतिहासिक काव्य-सृष्टि भी की।

गाँधीवादी सुधारक के रूप में :

गुप्त जी अपने समाज की रूढ़िगत परम्परा के प्रति आसक्ति, नवीन प्रथाओं के स्वीकार होने वाली झिझक, भूतकाल के वैभव का वृथा अभिमान वर्त्तमान युग के प्रति औदासिन्य, धार्मिक आडम्बर, यज्ञ यागकी क्रूरता एवं पाशवी वृत्ति अंध विश्वास, अधिकार लालसा, शक्तियों का दुरूपयोग स्वार्थपरायणता आदि, समाज-जीवन की उन्नति में बाधक प्रवृत्तियों को नष्ट कर उनके स्थान पर रूढ़िगत परम्पराओं का आवश्यकतानुसार त्याग, समयानुसार नवीन प्रथाओं का निर्माण, भूतकाल की अपेक्षा वर्त्तमान एवं भविष्य की ओर देखने की दृष्टि, मानवता शक्ति का सदुपयोग, सत्कर्म प्रवृत्ति सतर्कता देश प्रेम कर्तव्य परायणता आदि समाज को जीवन उच्चतर तथा आदर्श बनाने में उपयुक्त बातों की स्थापना करना चाहते हैं।"

—डॉ० कृष्ण दिवाकर

प्रायः कहा जाता है कि गुप्त जी प्राचीनता के पोषक थे किन्तु प्राचीनता के पोषक होते हुए भी उन्होंने समाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं में साम्प्रतिक ढंग से प्रस्तुत की है। उनकी रचनाओं में हमें अछूतों द्वारा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, ग्राम सुधार योजना, जाति बहिष्कार, नये युग के अनुरुप समाज संस्कार आदि के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। गुप्त जी जिस काल में थे वह काल नवजागरण का काल थे इसलिए वे इससे अप्रभावित नहीं रह सके। गुप्त जी के समस्त समाजिक चिन्तन पर मुख्यतः गाँधीवादी विचारों का प्रभाव था उन्होंने सामाजिक समस्याओं के समाधान का मार्ग वर्ग संघर्ष अथवा रक्त क्रान्ति का नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन और व्यक्ति विवेक को माना जिसका निदर्शन उनकी समस्त रचनाओं में हुआ है। विशेषतः गाँधी जी की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप ही गुप्त जी ने 'साकेत की विरहिनी उर्मिला की विलाप वेदना के स्थान पर यशोधरा के स्वावलम्बी और उत्तरदायी नारी चरित्र की अवतारणा की। यहाँ तक कि द्वापर की विधृता और कुब्जा की चारित्रिक क्रान्ति को बौद्धिक नारीत्व के आधुनिक आदर्श

के रुप में उभारा। गुप्त जी की इसी आधुनिकता का वर्णन करते हुए श्री भारत भूषण अग्रवाल ने इन्हें हिन्दी का पहला आधुनिक कवि कहा है।

नव शास्त्रीयतावादी महाकवि के रूप में :

आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने गुप्त जी के काव्य-शिल्प पर विचार करते हुऐ लिखा है कि- "मैथिलीशरण जी हिन्दी के इस युग के पहले कवि हैं, जिन्होंने कविता की ज्योति समय, समाज और आत्मा के भीतर देखी है, जिन्होंने नयी काव्य-धारा की अबाधगति से हिन्दी-समाज को अभिसिंचित किया है। उनकी भाषा-सम्बन्धिनी साधना उनके भावयोग के साथ उनकी समस्त कृतियों में व्याप्त दीख पड़ती है, जैसा कि उनके पहले के आधुनिक किसी कवि में नहीं दिखाई देती। एक चेतन काव्यात्मक अनुभूति के प्रकाश में उनकी रचनाएँ चमक रही है।"

वस्तुतः गुप्त जी कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से आधुनिक काव्य-परम्परा में नया मोड़ लाए। काव्यशास्त्रीय विधि-निषेधों का अतिक्रमण कर उन्होंने महाकवि "हरिऔध" के महाकाव्यात्मक प्रबन्ध-शिल्प को विकसित किया तथा परम्परागत पद्धति को आत्मसात् कर नवीनतर रचना-विधान का सूत्रपात करना चाहा। निश्चय ही परम्परावादी समीअकों की दृष्टि में गुप्त जी की किसी भी कृति को शास्त्रीय शैली में महाकाव्य नहीं कहा जा सकता; किन्तु उन्होंने तो महाकाव्य की श्रेव्यवादी शैली के स्थान पर नव शास्त्रीयतावादी शैली में महाकाव्यों की नूतन प्रविधि का प्रवर्तन किया; जिसका समाहरण महाकवि "हरिऔध" कर चुके थे। गुप्त जी ने महाकाव्यों के स्वरूप संगठन में प्रतिपाद्य विषय की युगीन महत्ता, उदात्त संदेश और गम्भीर प्रविधि को ही विशेष महत्व दिया, जिससे मानव-समुदाय को व्यापक जीवन-दर्शन विराट भाव-बोध तथा आदर्श साधना प्रक्रिया का प्रामाणिक परिज्ञान हो सके। निश्चय ही उन्होने प्रबन्ध प्रविधि में विषयोचित अनुकूलता का भी समाहार किया और काव्य की शिल्प विद्या का संश्लिष्ट प्रयोग किया। गुप्त जो ने 'रामायण' और 'महाभारत' के अख्यानों तथा चरित्रों में भारतीय जीवन की सांस्कृतिक विराट्ता का दिग्दर्शन कर के अपने प्रतिनिधि महाकाव्यों तथा खण्डकाव्यों में आधुनिक सामाजिक विसंगतियों के लिये आदर्श निदान प्रस्तुत करते हुए मानवीय संवेदना के सभी अंगों तथा रुपों का सरल तथा सहज वर्णन किया। जिसमें उनकी समन्वयवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। उन्होंने भारतीय इतिहास को वैदिक-पौराणिक संस्कृति तथा आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता के सापेक्षिक स्वरूपों में व्याख्यायित करते हुए भी भारतीय ग्रामीण जीवन, जन-जाति और दलित-दमित समाज के प्रकृत आधार तथा स्वच्छंद विचारों के प्रति अकृत आस्था प्रकट की। इसके अतिरिक्त 'विकट भट्ट', सिद्धराज राजपूत इतिहास से 'गुरुकुल' सिक्ख इतिहास से, 'काबा और कर्बला' मुस्लिलम इतिहास से तथा 'अर्जन' और 'विसर्जन' विदेश के इतिहास संबद्ध है, तथा अजित और किसान सामयिक समाचारों पर अवलम्बित है।

साधारणतः गुप्त जी की रचनाओं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है १. प्रबन्ध-काव्य, २. मुक्तक-काव्य, ३. प्रदृश्य काव्य।

प्रबन्धकार के रूप में गुप्त जी हमारे सामने 'साकेत' तथा 'जयभारत' के रचनाकार के रुप में आते हैं, जिनमें उन्होंने भारतीय पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीय-सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। 'साकेत' और

'यशोधरा' में उन्होंने उपेक्षिता नारियों की नवजागृति का युगीन संदेश दिया है। 'द्वापर' में पौराणिक आख्यानों के चारित्रिक वैष्ट्य को आधुनिक बौद्धिक परिवेश में प्रस्तुत किया।

मुक्तककार के रूप में गुप्तजी की रचनाओं के संग्रह 'पद्य-प्रबन्ध' 'स्वदेश संगीत' और 'मंगलधर' प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें युग-समस्याओं के विविध पक्षों का विवेचन किया गया है। इनके अतिरिक्त 'भारत-भारती' तथा 'हिन्दू' को भी मुक्तक रचना के अन्तर्गत ही समाहित किया जाता, किन्तु श्री गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीश' ने भारत-भारती' तथा 'हिन्दू काव्यकृतियों' को स्फुट काव्य के पर्याय रूप में आख्यायित किया है।

गुप्त जी मुख्य रूप से कवि ही थे, किन्तु उन्होंने तीन नाटकों की रचना भी की है—'तिलोत्तमा' 'चन्द्रहास' और 'अनघ'। वस्तुतः गुप्त जी ने नाट्य-शिल्प की रंगमंचीयता तथा अभिनेयता के प्रभावोत्पादक पहलुओं पर विशेष ध्यान न देकर उनमें वस्तु-कथ्य को ही मुख्य रूप से प्रस्थापित किया है, अतएव उनके नाटक पठनीय और विचारणीय ही अधिक हैं, प्रदर्शनीय और सम्प्रेषणीय कम। यही कारण है कि गुप्त जी की नाट्य सृष्टि को नव-शास्त्रीयतावादी दृष्टि से दृश्यकाव्य न कहकर प्रदृश्यकाव्य कहा जाना चाहिए।

अन्ततः यही कहा जा सकता है कि गुप्त जी अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, जन-जागरण एवं आदर्शवाद का व्यापक दृश्य-फलक दृष्टिगोचर होता है। अतः आचार्य द्विवेदी के शब्दों में "तब से ('भारत-भारती' के प्रकाशन के समय से) गुप्त जी को लोक-चित में राष्ट्र प्रीति की भावना जगानेवाले सबसे शक्तिशाली कवि के रूप में हिन्दी-जगत देखता आया है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि हैं।"

পরিচিতি

সুনীল রায়চৌধুরী	ঃ	অধ্যক্ষ
গৌরীশংকর ঘটক	ঃ	অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ
শিরিণ মাসুদ	ঃ	অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
স্বরাজব্রত সেনশর্মা	ঃ	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বার্ণিক রায়	ঃ	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুকান্ত চৌধুরী	ঃ	অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ
নীরদবরণ চক্রবর্তী	ঃ	অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়	ঃ	অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ।

প্রথম বর্ষ

অচ্যুত মণ্ডল আপোষহীন উত্তেজনায় সদাসতর্ক থাকেন। এবং উত্তেজনাকে প্রাণের লক্ষণ বলে মনে করেন। কল্পনাতে ইচ্ছেমতো জীবন-যাপন করেন। ইতিহাস পড়লেও পাবেন ক্যান্টিনে।

অদ্রীশ বিশ্বাস 'লিটু' আন্দোলনের 'পিঠু' পোষক। দিশাহীনভাবে 'বিদিশা'র সঙ্গে যুক্ত। জ্যামিতির সাহায্যে আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপথ বর্ণনা করেন, কারণ বিষয় বাংলা।

অমিতেন্দু পালিত 'পালিত' পুত্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'ভাইপো' হিসেবে পরিচিত। রূপা-লী আলোয় গদ্যকার হয়ে ওঠার প্রসাধন রত। অর্থনীতি পড়েন।

অভীক বর্মন প্রেসিডেন্সি চত্বর থেকে বিবেকানন্দ পার্কের সীমানা অবধি নিরলস গতিবিধি ছাড়াও ইনি দর্শন ও Nonsense Rhyme সম্বন্ধে ভাবেন। কর্মসূত্রে অর্থনীতি থেকে শারীরতত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছেন।

ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত পরিচিত অবয়বে পরিচিত তার্কিক। বিষয় অর্থনীতি।

বিপ্লব মুখোপাধ্যায় 'প্রেসিডেন্সী কলেজের এক সুদর্শন তরুণ' (সূত্র ঃ আজকাল) 'ভেতরে ফ্রয়েড, বাইরে মার্কস' (সূত্র ঃ অজ্ঞাত) 'দর্শনের ছাত্র' (সূত্র ঃ এন. বি. সি.)।

সুমন ধর ইন্দো-ঈঙ্গ-আফ্রিকান পরিবেশে 'ঘোঁতন' নামে সহজলভ্য। আদরের ছেলেমেয়ের নাম 'ধর্মঘট' ও 'মিছিল' রাখবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 'ইংরেজীতে কুলকুচি করে ক্যান্টিনে প্রাতঃরাশ সারেন।

সৌগত ঘোষ ক্যান্টিনেই অনার্স করছেন অর্থনীতি ভুলে! এ'র হাবভাবে সুকুমার রায়ের একটি কবিতা মনে পড়ে। নীলিমনীলিকাময় আকাশ দেখেন, আর তাস খেলেন।

দ্বিতীয় বর্ষ

অসিত সেন নাম বা পদবী উভয়ই সরল হলেও এ যুবকের গদ্য কম্পোজিটরদের হিমশিম খাইয়েছে। 'সিসৃক্ষা' পত্রিকার এই সম্পাদক সম্ভবতঃ 'চলন্তিকা' অথবা 'শব্দকল্পদ্রুম' মাথার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করেন। ইনি বাংলা বিভাগকে না বাংলা বিভাগ এঁকে ধন্য করে বোঝা মুশকিল।

কৌশিক চৌধুরী এখনও কারও 'পরশরাগে চিত্ত হ'লনা রঞ্জিত।' আক্ষেপে আছেন। আছেন বিপ্লবেও। আর সমব্যথীরা জানেন আছেন বিশেষরূপে প্লবতায়। মাঝেমাঝেই হি হি করে কথা বলেন। থেকেও নেই শুধু গণিতে।

জয়িতা ঘোষ 'ঠাণ্ডা ঘরে একটি রঙিন স্বপ্ন'। প্রিয় রঙ বেগুনী, নিজেকে প্রিয়াজ্ঞানে, পরকে পুত্রজ্ঞানে সেবা করে থাকেন। ইতিহাসের ছাত্রী। এ সংখ্যার প্রকাশনা-সচিব।

দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকায় লেখা ছাপাবার স্বপ্ন ছোটবেলা থেকে। তাই পড়তে আসা এই কলেজে। মৃদুভাষী সুদর্শন এই তরুণ বাংলা বিভাগীয় সদস্য।

সৌম্য দাশগুপ্ত তথা'য় "ভেজে চিঁড়ে মুড়ি খই বাতাসা যত্রতত্র যথাতথা।" বলাবাহুল্য আসল নাম তথাগত। প্রতিষ্ঠানের বৈধ ভাইপো। গণনায় অনভ্যস্ত হলেও, প্রথম বর্ষের এক সুদর্শনা হাত দেখাতে চেয়েছিল, যেহেতু 'রাশি বিজ্ঞানে'র ছাত্র।

তৃতীয় বর্ষ

অতনু বসু কলেজ ফেস্টিভ্যাল সূত্রে 'বস্' নামে পরিচিত। দীর্ঘ সময়ের জন্য ডুব মেরে মাঝে মাঝে অতিব্যস্তভাবে উঁকিঝুঁকি মারেন। শারীরতত্ত্ব।

অপূর্ব সাহা চারণ কবির চেহারায় পেশা কবি ও কবিতা চরানো। 'মাছের চোখে' বিশ্বদর্শন করেন। দ্বিধাগ্রস্ত। কেননা, 'অসহ্য লাগে এইসব।' আদর্শ 'বাঙালী'।

উদ্দালক ভট্টাচার্য ডাকনাম 'বুজো'। রেগে গেলে মিটিং চলাকালীন হাত-পা নাড়াতে নাড়াতে কখনো-সখনো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। চতুর্থ ধারার বিপ্লবী। ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের একমাত্র ছাত্র।

উদয়ন মজুমদার হাতভাঙা, কুকুরের কামড় ও gastritis প্রভৃতি বিপর্যয়ের মধ্যেও জীবিত এবং নির্লিপ্তে সেই এক ও অনন্য 'উদো'। দেখতে ভিজে বেড়াল হ'লেও……। এর 'ভরপুর' ভালো লাগে। ইংরাজী।

কৃত্তিবাস রায় ক্যান্টিনে এলেই অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকান। মহিলাকুলের অ-প্রিয় এই কবিপ্রবর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম সারির ছাত্র। বাংলা একাডেমী থেকে ইতিমধ্যেই বই ছাপাবার টাকা পেয়েছেন।

কমলেশ পাণ্ডে হিন্দি ছেড়ে বাংলায় কথা বললে দাঁড়াতে হয় খানিকক্ষণ। একেবারে অধ্যাপকদের মতো হাঁটাচলা। একবার হাসতে শুরু করলে আপনজনদের ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়েন।

যশোধরা রায়চৌধুরী যশের জন্য লেখেন না, গুপীবাঘার জন্য লেখেন। যদি কোনদিন সুর হয়ে বেরোয়……। দর্শন পড়েন তাই একজোড়া চশমা নিয়েছেন।

শুভা মুখোপাধ্যায় 'বিবেক বোধের শিকার'। নিজের অজান্তেই কৃত্তিবাসের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। ইংরেজীতে প্রচুর নম্বর পেয়ে এ সংখ্যার সম্পাদনা করেছেন।

বিদায়ী তৃতীয় বর্ষ

অশোক ত্রিপাঠী হোস্টেলের 'কীর্তিমান' পুরুষ। ইউনিভার্সিটি-র সামনের চৌকিতে গভীর আলাপচারিতায় মগ্ন অবস্থায় মাঝে মধ্যে দেখতে পাবেন। রাষ্ট্রভাষা' বলেন, শোনেন।

অনন্যা চট্টোপাধ্যায় অনন্যা, 'রূপে গুণে তিনি সাধারণ না ; নাচেন। (বাকিটা 'ইংরেজী'তে ভাবতে থাকুন)

উদয়ন মিত্র প্রেসিডেন্সীর ইংরেজী বিভাগের সেমিনার ছেড়ে এখন যাদবপুরে T.T. ও আরো এক-আধটি 'খেলা' খেলার চেষ্টা করছেন। সেহেতু অল্পস্বল্প সাহিত্যচর্চা—

সুহিতকুমার সেন শিবপূজা ক'রে প্রায়শই প্রসাদ পান। এখন দিল্লীতে 'ইতিহাস' শিখছেন।

সুদীপ্ত সরস্বতী রাতের খাবার খেয়ে হোস্টেলের যে কোনো কারুর ঘরে ঘণ্টাখানেক ভারী বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বলে থাকেন এসব শ্রোতার হজমরক্ষার তাগিদেই। এসব জানেন ভালোই, বিষয় শারীরতত্ত্ব হেতু।

স্বপন রায় 'জন্তু বিজ্ঞানী'। আকাশ পথে কবিতা বিতরণ করেন। মাঝে মধ্যে পুরোনো কবিতা বদলে নতুন কবিতা ছাপার প্রস্তাব দেন। চেহারায় হোস্টেলীয় রুক্ষতা, কাঁধে পেণ্ডু-ব্যাগ, নিজে মূর্ত পেণ্ডুলাম।

স্নাতকোত্তর বিভাগ

সুকৃতি লহরী যে কোন বয়সীদের আড্ডাতেই এর জুড়ি মেলা ভার। গতবছর 'পাত্র চাই' কলমে স্বনামে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। আবৃত্তি করতেন, এখন নাট্যচর্চায়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ধ্বজাধারী।

প্রাক্তন ছাত্র

অভিজিৎ দত্ত এটা সবাই জানে যে তিনি 'পাটালি' গুড় খেতে ভালোবাসেন, সাহিত্যজগতে হীরে, চুনী, 'রুবি', পান্না ইত্যাদি খোঁজেন। এখন দিল্লীতে অর্থনীতি করছেন কারণ রাজনীতি ভুলে গেছেন।

বিনয় মজুমদার কবি।

ভানুসিংহ ঘোষ ইনি সুদর্শন এবং সেটা গোঁফজোড়া আছে ব'লেই। মজার একটা চশমা পরেন। খুব অল্পই আর কলেজে আসেন, কিন্তু ক'লজের জোর না থাকলে বাড়িতে আজকাল মহিলাদের আমন্ত্রণ ক'রে 'মাজা ম্যাংগো' খাওয়ান কি ক'রে !

সমীর রায় নারীর রূপবর্ণনায় কবিকুলের সমস্ত কল্পনাকে নস্যাৎ ক'রে ইনি বলেন—'ঠিক ঠিক জিনিস ঠিক ঠিক জায়গায় থাকলেই হ'ল'। অসাধারণ ছবি আঁকেন। বান্ধবীর শার্ট গায়ে চড়িয়ে কলেজে এসেছিলেন। স্নাতকোত্তর এই পদার্থবিদ 'বিজ্ঞানচেতনা-সমন্বয়ে'র মাধ্যমে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে নিযুক্ত রয়েছেন।

শান্তনু মজুমদার শোনা যায় কোন এক বান্ধবীকে দেখে শতাধিক (১৩৬) সনেট রচনা করেছেন। স্নাতকোত্তর ইংরেজীতে বসবাস।

শঙ্খ ঘোষ কবি এবং অধ্যাপক।

শৈবাল গুপ্ত প্রাক্তন ছাত্র। Alumni Association-এর সক্রিয় কর্মী।

পুনশ্চ : কারো সম্পর্কে বিশদ বিবরণ বা তথ্যাদি পেতে হ'লে গোপনে যোগাযোগ করুন আমাদের ক্যান্টিন কার্যালয়ে।

Past Editors and Secretaries

Year	*Editors*	*Secretaries*
1914-15	Pramatha Nath Banerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangooli
1920-21	Phiroze E. Dastoor	Shyama Prasad Mookerjee
1921-22	Shyama Prasad Mookerjee	Bimal Kumar Bhattacharya
	Brajakanta Guha	Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Uma Prasad Mookerjee	Akshay Kumar Sarkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K. Mukherjee	
1926-27	Humayun Kabir	Lokesh Chandra Guha Roy
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Sunit Kumar Indra
1928-29	Sunit Kumar Indra	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Taraknath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Ajit Nath Roy
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Ardhendu Bakshi	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen	Abu Sayeed Chowdhury
	Nirmal Chandra Sen Gupta	
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin	Bimal Chandra Dutta
1940-41	Manilal Banerjee	Prabhat Prasun Modak
1941-42	Arun Benerjee	Golam Karim
1942-46		No Publication
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindramohan Chakravarti
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Manas Mukutmani

Year	*Editor*	*Secrataries*
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Ashok Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjay Guha	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakravarty	Rupendra Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherji	Alok Kumar Mukherjee
	Mihir Bhattacharya	
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee	Pritis Nandy
1964-65	Subhas Basu	Biswanath Maity
1965-66		No Publication
1966-67	Sanjay Kshetry	Gautam Bhadra
1967-68		No Publication
1968-69	Abhijit Sen	Rebanta Ghosh
1969-72		No Publication
1972-73	Anup Kumar Sinha	Rudrangshu Mukherjee
1073-74	Rudrangshu Mukherjee	Swapan Chakravarty
1974-75	Swapan Chakravarty	Suranjan Das
1975-76	Shankar Nath Sen	
1976-77		No Publication
1977-78	Sugata Bose	Paramita Banerjee
	Gautam Basu	
1978-81		No Publication
1981-82	Debasis Banerjee	Banya Datta
	Somak Ray Chaudhury	
1982-83		No Publication
I983-84	Sudipta Sen	Subrata Sen
	Bishnupriya Ghosh	
1985-86	Brinda Bose	Chandreyee Niyogi
	Anjan Guhathakurta	
1986-87	Subha Mukherjee	Jayita Ghosh
	Apurba Saha	

With the compliments from

TATA STEEL

Space donated by

A Well Wisher

With Best Compliments From

KESORAM INDUSTRIES LIMITED

9/1, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700 001.

Manufacturers of Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon Yarn, Transparent Cellulose Film, Sulphuric Acid, Carbon-di-Sulphide, Cast Iron, Spun Pipes, Cement & Refractories etc. etc.

SECTIONS :	MILLS :
Textile Section	42, Garden Reach Road, Calcutta.
Rayon & T P Section	Tribeni, Dist. Hoogly.
Spun Pipe Section	Bansbaria, Dist. Hooghly.
Cement Section	Basantnegar, Dist. Karimnagar (A.P.)
Refractory Section	Kulti, Dist. Burdwan.

With Best Compliments From

VOLTAS LIMITED

Air Conditioning & Refrigeration Division
GILLANDER HOUSE

Netaji Subhas Road
Calcutta-700 001

Post Box 606 **Phone : 20-5731 (8 Lines)**
Telex : 021-7297 / 2572 CALCATTA
Gram : "SATMOTOR" Calcutta-700 001

With Best Compliments Of :

Turnkey International Limited

50. Chowringhee Road (11th Floor)
Calcutta-700 071

PHONE : 43-3955, 43-4356, 44-7206
GRAM : TURNIN. CALCUTTA
TELEX : 021-5521 JMAC IN

It's the mellow hour after sunset.....the busy day yields to the resting hours of approaching night..... .. the silver sickle of the Moon can be seen above the trees.....

heart in her arms

The beloved weaves the charming spell of sublime music around you with the dulcet tunes she takes your heart in her arms..... .....the moments live within you forever.....

DWARKIN
& Son Private Ltd.
1-2, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-1

With Compliments from :

Phillips Carbon Black Ltd.

31, Netaji Subhas Road
Calcutta-700 001

With Best Compliments Of :

M/S North Ramgarh Coal Company Pvt. Ltd.

11, British Indian Street
Calcutta-700069
Phone : 20-7613, 23-2055

With Best Compliments From :

Mahasukhram Prabhudayal

1, BISTUPUR, JAMSHEDPUR-831001
BIHAR

With best compliments from

Nulab Equipment Company Pvt. Ltd.

Head Office :
1-C THIRD FLOOR, "VEENA BEENA" TURNER ROAD
BANDRA (WEST), BOMBAY-400050

Phone **: 64-24039, 64-23846, 60-44945**
Telex **: 011-75431 ABC IN CABLE : MENTSLAB**

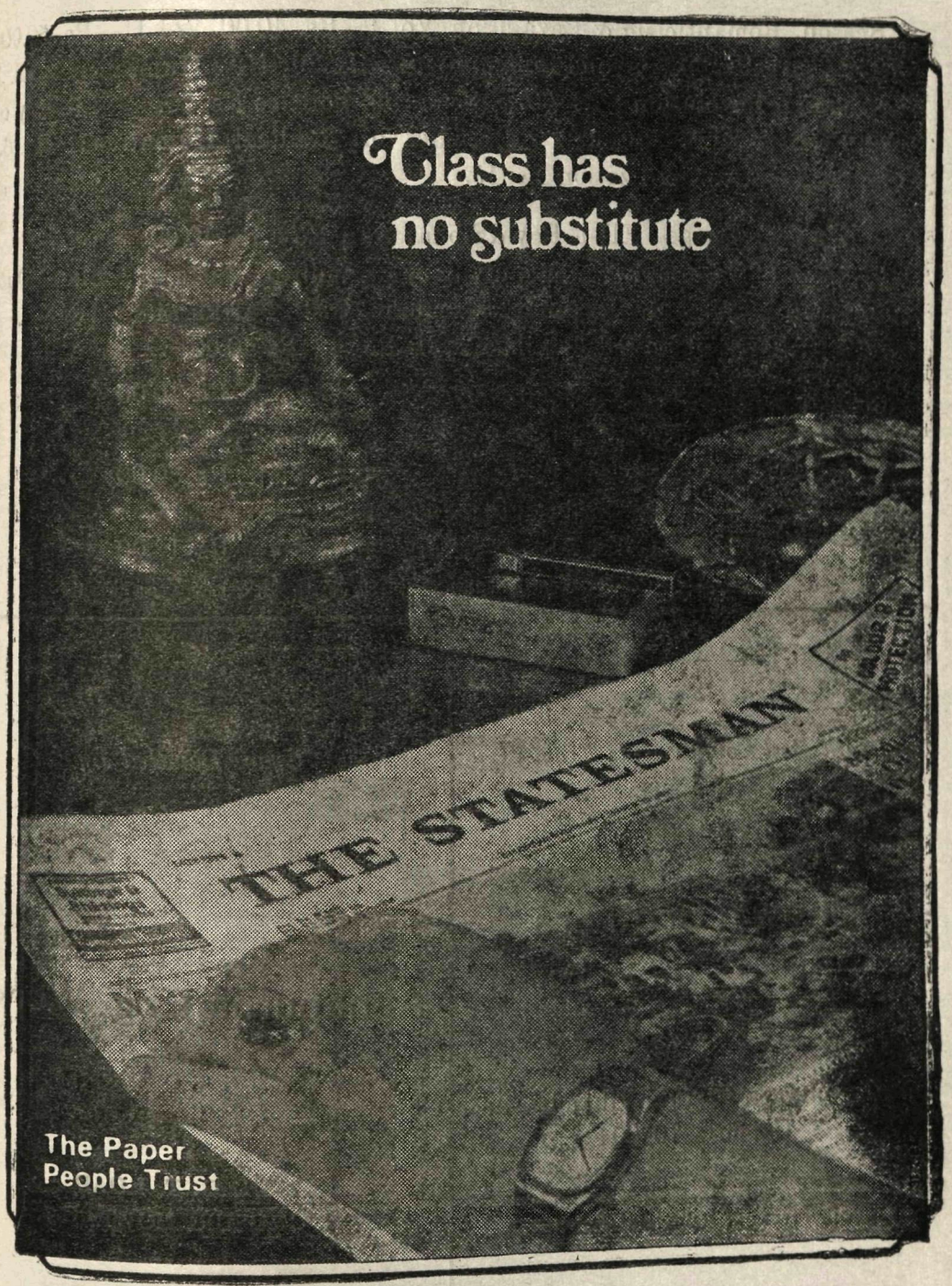
Class has
no substitute
THE STATESMAN
The Paper
People Trust

RENAISSANCE BOOKS

M. N. Roy

Reason, Romanticism & Revalution Vol I—Rs. 40.00 Vol II—Rs. 50.00
Materialism—Rs. 30. Beyond Communism—Rs. 20. New Humanism—Rs. 12.
The Russian Revolution—Rs. 60. Scientific Politics Rs. 20. Library of a
Revolutionary Rs. 6. A Course of Studies on Radical Humanism—Rs. 6.00
From Savagery to Civilization Rs. 15.

* * *

In Man's Own Image : Ellen Roy &Sibnarayan Roy Rs 10.00
M. N. Roy : Philosopher Revolutionary : Sudhin Datta, Amlan Dutta,
Sibnarayan Roy, V. M. Tarkunde, Blackham, G. P. Parikh and others
(Edited by Sibnarayan Roy) Rs 40.00

মৌমাছিতন্ত্র শিবনারায়ণ রায় Rs 10.00

বাংলা পত্রিকা

জিজ্ঞাসা (ত্রৈমাসিক) বার্ষিক চাঁদা Rs 30.00
সম্পাদক : শিবনারায়ণ রায়

পুরোগামী (পাক্ষিক) বার্ষিক চাঁদা Rs 12.00
সম্পাদক : স্বরাজ সেনগুপ্ত, মনোজ দত্ত।

With Best Compliments From :

Bhowal Brothers

158/C, Acharya Prafulla Chandra Road
Calcutta-700004

Manufacturers of Industrial Lubricants.

Space Donated By

Annapurna Eng. Works

233/1, G. T. ROAD
N. GHOSURI HOWRAH-7

With Best Compliments From :

M/S Deys Marketing Syndicate

69, LINTON STREET, CALCUTTA-700 014

A WELL KNOWN DISTRIBUTION
HOUSE OF REPUTED CONSUMER PRODUCTS

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

West Bengal Trading Corporation

ENGINEER MANUFACTURER AND SHIPCHANDLERS

67B, Netaji Subhash Road, R. No. 4,
P. B. No. 771 Calutta-700 001
Phone : (O) 257218, 257033 (R) 279941, 277990
Gram : TASBEEH

Bombay Branch : 12, Khokha Bazar, Bombay-400 003
Gram : IRONBOX OFF & RESI : 327183, 348981
Madras Branch : 48, Venkatachala Mudali Street,
Madras-600 003 Phone No. 36252
Vishaka Patnam Branch : 28-16-5/3, Saraswathi Junction
Vishakhapatnam-530002

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, আর্য ম্যানসন,
(নবম তল), কলিকাতা-৭০০ ০১৩
ফোন : ২৬-৭৮৫৪

পর্ষদ প্রকাশিত বিজ্ঞান পুস্তিকা বিষয়ক কয়েকটি বই—

জিওল মাছ	শ্রীশচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২·০০
পেশাগত ব্যাধি	শ্রীকুমার রায়	৭·০০
আমাদের দৃষ্টিতে গণিত	প্রদীপকুমার মজুমদার	৭·০০
বয়ঃসন্ধি	বাসুদেব দত্তচৌধুরী	৯·০০
পশুপাখীর আচার ব্যবহার	জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	৮·০০
ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি	সঙ্কর্ষণ রায়	৮·০০
একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ	কানাইলাল মুখোপাধ্যায়	১০·০০
শক্তি : বিভিন্ন উৎস	অমিতাভ রায়	৭·০০
জৈবসার ও কৃষি বিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান	শ্যামল বণিক	১২·০০
ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার	ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	৬·০০
গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি	দুর্গা বসু	১০·০০
হাঁপানি রোগ	মনীশচন্দ্র প্রধান	৪·০০
নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র	সুশীল ঘোষ	১২·০০
অতিশৈত্যের কথা	দিলীপকুমার চক্রবর্তী	৭·০০
সয়াবিন	দ্বিজেন গুহবক্সী	৯·০০
পরিবর্তী প্রবাহ	সমীরকুমার ঘোষ	৭·০০
এফিড বা জাব পোকা	মনোরঞ্জন ঘোষ	১২·০০

কলিকাতা সংস্কৃত স্কুলের নীচতলায় অবস্থিত পর্ষদের বিপণন কেন্দ্রে এবং কলেজ স্ট্রীটের পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে পর্ষদ প্রকাশিত সমস্ত বই পাওয়া যায়। কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ের অন্যান্য বইগুলির জন্য যোগাযোগ করুন।

রায় | ২৫৯৮৬